এক নায়িকার উপাখ্যান

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২

সৌমিত মণ্ডল
স্নেহাস্পদেষু

এক নায়িকার উপাখ্যান

এক

সন্ধের আগে আগে আজ বাড়ি ফিরে এল রণিতা। তার বয়স সবে সাতাশ পেরিয়েছে। ইস্পাতের ফলার মতো মেদশূন্য, ঝকঝকে চেহারা। ধারাল, লম্বাটে মুখ। চিবুকের দৃঢ়তা, বড় বড় চোখের গভীর, উজ্জ্বল দৃষ্টি এবং কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা উড়ন্ত বাদামি চুল তার মধ্যে এনে দিয়েছে দারুণ এক ব্যক্তিত্ব। তাকে বাঙালি তো নয়ই, কেমন যেন অভারতীয় মনে হয়। পুরনো উপমা দিয়ে বলা যায়, রণিতার গায়ের রং একদা ছিল স্বর্ণাভ, আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। কিন্তু রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চামড়া ট্যান হয়ে গেছে। তার যা কাজ তাতে ভারতীয় ঋতুগুলির তীব্র উত্তাপ বা শীতলতা থেকে নিজেকে বাঁচানো অসম্ভব। দার্জিলিং-এর চা-বাগানে, আসামের জঙ্গলে, মধ্যপ্রদেশ কি ওড়িশার আদিবাসী গ্রামে ব্যস্ত ভূপর্যটকের মতো তাকে আকছার ছুটে বেড়াতে হয়। তার কাজটাই অনেকের থেকে আলাদা কিন্তু সে কথা পরে।

রণিতার পরনে এই মুহূর্তে ফেডেড জিনস আর শার্ট, পায়ে পুরু সোলের লেডিজ শ্যু, বাঁ হাতে চওড়া স্টিল ব্যাণ্ডে ওভাল শেপের ঘড়ি, গলায় লম্বা সরু সোনার চেইন যার লকেট হল একটা বড় সাইজের ক্রস। রণিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু মা-বাবার সন্তান, নিজেকে সে অবশ্য বলে 'নন- প্র্যাকটিসিং হিন্দু'। ক্রসটা সম্পর্কে জানতে চাইলে তার উত্তর—এক মহামানবের জীবনদানের প্রতীক ওটা। ক্রসটা নাকি তাকে কখনও ভেঙে পড়তে দেয় না, সারাক্ষণ অফুরান সাহস জুগিয়ে যায়। এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব বিশ্বাসের ব্যাপার। এছাড়া কাঁধ থেকে একটা ঢাউস চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে। ওটার ভেতরে কী নেই? ক্যামেরা, বিরাট সাইজের ডায়েরি, পেন, পেন্সিল থেকে শুরু করে নানা বই এবং ম্যাগাজিন থেকে টুকে আনা গোছা গোছা নোটস, নিজের লেখা দু-একটা ফিল্ম স্ক্রিপ্ট, ইত্যাদি।

রণিতাদের বাড়িটা ওল্ড বালিগঞ্জের এক নিরিবিলি পাড়ায়। নাম 'অন্তরা'। পঞ্চাশ বছর আগে এটা তৈরি করিয়েছিলেন তার ঠাকুরদা, নামকরণও তাঁরই। রণিতাদের পদবি মিত্র। সেই হিসেবে 'মিত্র নিবাস', 'মিত্র ভিলা' বা 'মিত্র লজ' হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। 'শান্তিনীড়' কি 'সন্ধ্যাদীপ'ও হতে পারত।

তার জায়গায় কিনা 'অন্তরা'। নামটার ভেতর গানের সুরেলা ঝংকার রয়েছে। ঠাকুরদা কবেই মারা গেছেন, রণিতার জন্মেরও বেশ কয়েক বছর আগে, তবু এমন একটা চমৎকার নামের জন্য সে এখনও ভদ্রলোককে দশবার কুর্নিশ করে।

ফুটপাথের গা ঘেঁষে লোহার ভারি গেট। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে আসে রণিতা।

গেটের পর থেকেই মাঝারি মাপের ছিমছাম বাগান। সেখানে সবুজ ঘাসের কার্পেট, বট আর অশ্বত্থের বনসাই, ছাতার আকারের সারি সারি ঝাউ এবং সিলভার পাইনের লাইন। আর আছে নানা চেহারার মরশুমি ফুলের গাছ। প্রতিটি গাছের সতেজ পাতায় বা ফুলে রয়েছে যত্ন, পরিশ্রম ও মমতার ছাপ। এমন একখানা চমৎকার বাগান নিজের থেকে তৈরি হয়নি, ঢালতে হয়েছে প্রচুর টাকা।

বাগানটাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে নুড়ির পথ চলে গেছে। রণিতা নুড়ির ওপর পা ফেলে ফেলে চলে আসে গাড়ি-বারান্দায়। তারপর চওড়া চওড়া দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই সেগুন কাঠের কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড দরজা। তার গায়ে কলিং বেলের সুইচ। রণিতা সেটায় আঙুলের চাপ দিতেই ভেতর থেকে পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ ভেসে আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়ায় অনাথ।

নিরেট চেহারার মাঝবয়সী এই কাজের লোকটি তিরিশ বছর এ বাড়িতে আছে। পরনে খাটো ধুতি আর মোটা লং ক্লথের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। এই পোশাকেই তাকে আজন্ম দেখে আসছে রণিতা।

অনাথ খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলে, 'ছোটদিদি, তুমি! অ্যাত তাড়াতাড়ি ফিইরে এলে!' তার আদি বাড়ি লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের কোনো একটা গ্রামে। তিরিশটা বছর বালিগঞ্জের মতো জায়গায় কেটে গেল, তবু তার জিভ থেকে এখনও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক টানটা মুছে যায়নি।

অনাথের বিস্ময়ের কারণ আছে। কেননা রণিতা রাতে সাড়ে আটটা ন'টার আগে ফেরে না। কোনো কোনো দিন আরো দেরি হয়ে যায়। আজ সে গিয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী মারিয়াদের সম্বন্ধে বেশ ক'টা বই পড়ে অনেক নোট নিয়েছে। সেখান থেকে তার যাবার কথা ছিল শিশির মঞ্চে। নিউ ফিল্ম ক্লাব সন্ধ্যায় ফেদেরিকো ফেলিনির 'লা স্ট্রাডা' ছবিটা ওখানে দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। রণিতা ওই ক্লাবের মেম্বার। কিন্তু ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাজটা শেষ হবার পর কেন যেন শিশির মঞ্চে যেতে ইচ্ছা হল না। হয়তো ভেতরে ভেতরে ক্লান্তি জমে ছিল, সোজা সে বাড়ি চলে আসে। এ সপ্তাহেই ছবিটার আরেকটা শো হবে, তখন দেখে নেওয়া যাবে।

'এমনি চলে এলাম—' ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে অনাথের পাশ দিয়ে ভেতরে চলে আসে রণিতা।

দরজার পর থেকেই বেশ চওড়া একটা প্যাসেজ। তার দু'ধারে ড্রইং রুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর এবং কাজের লোকদের থাকার ঘর।

নাম বাদ দিলে এই দোতলা বাড়িটার সমস্ত কিছুতেই প্রাচীন কালের ছাপ। গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ি থেকে শুরু করে সবগুলো ঘরের মেঝেই শ্বেত পাথরে মোড়া। দরজাগুলো পুরু এবং ভারি ভারি। জানালায় খড়খড়ি ছাড়াও রঙিন কাচের শার্সি। সিলিংয়ে এবং দেওয়ালে পঙ্খের নিখুঁত নকশা। মেহগনি কাঠের জমকালো ক্যাবিনেট, ল্যাম্প শেড, চার ব্লেডের ফ্যান—সব যেন পঞ্চাশ বছর আগের সময়টাকে গভীর আবেগে ধরে রেখেছে।

রণিতার বন্ধুরা যখনই আসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, 'দারুণ! তোদের বাড়িতে এলে অ্যারিস্টোক্র্যাসি ব্যাপারটা ফিল করা যায়।' তারা কতটা অভিজাত, রণিতা কোনো দিন ভেবে দেখেনি। তবে শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসছে, চারপাশের বনেদি বাড়িগুলো ভেঙে তোলা হচ্ছে বাক্স প্যাটার্নের বিশাল বিশাল হাই-রাইজ, কলকাতা মেট্রোপলিসের মানুষ আটশ' কি হাজার স্কোয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্টে নিজেদের বন্দি করে ফেলছে ক্রমাগত, তখন পঞ্চাশ বছর আগের খোলামেলা পুরনো গন্ধওলা আবহাওয়ায় থাকতে ভালই লাগে রণিতার।

চারপাশে আলো জ্বলছিল। প্যাসেজ ধরে ক'পা এগুলেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। তার দু'ধারে পেতলের চকচকে পাত-বসানো কাঠের রেলিং।

সিঁড়িতে সবে পা রেখেছে রণিতা, অনাথ দরজা বন্ধ করে প্রায় দৌড়েই কাছে চলে আসে। একটু অবাক হয়ে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে?'

ব্যস্তভাবে অনাথ বলে, 'হ্যাঁ। কে একজন দিল্লি না বোম্বাই থিকে তোমারে দু'বার ফোন করেছিল। খুব নাকিন জরুরি।'

রোজ অনেক ফোন আসে রণিতার কিন্তু দিল্লি বা বম্বে থেকে কে করতে পারে? ওই দুই শহরে তার বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে, তাদেরই কি কেউ? দু'বার যখন করেছে, নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আর্জেন্ট। সে জিজ্ঞেস করে, 'কে ফোন করেছে, জানো?'

অনাথ বলে, 'আমিই ফোনটা ধরেছিলাম গ ছোটদিদি। তা ইংরিজি আর হিন্দি মিন্দিতে কী কইতে লাগল। বুজতে না পেরে মাকে দিলাম। মা সব জানেন।' রণিতার মাকে সে মা বলে।

'ঠিক আছে।'

একসঙ্গে দুটো করে স্টেপ পেরিয়ে পেরিয়ে পলকে দোতলায় উঠে আসে রণিতা। এখানে প্রকাণ্ড একটা হল-কে ঘিরে পাঁচটা বেড-রুম, প্রতিটি ঘরের সঙ্গে

অ্যাটাচড বাথ। বেড-রুমগুলোর একটা রণিতার, একটা তার মা-বাবার, একটা দাদার, একটায় বাবার লাইব্রেরি, বাকিটা খালি পড়ে থাকে। দিদি-জামাইবাবু বা অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব এলে ওখানে থাকে।

হল-ঘরের তিন কোণে তিন সেট সোফা আর সেন্টার টেবল। একসঙ্গে রণিতা, তার দাদা বা বাবার কাছে ভিজিটররা এলে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য এই ব্যবস্থা। অবশ্য একতলায় একটা ড্রইং রুম আছে, কিন্তু সেটা বন্ধই থাকে। কেউ এলে পারতপক্ষে রণিতারা নিচে নামতে চায় না, অগত্যা ভিজিটরদের সঙ্গে করে অনাথ ওপরে নিয়ে আসে।

হল-এর মাঝখানে রঙিন টিভি, পিয়ানো, ভি সি আর, টেলিফোন এবং অজস্র ক্যাসেট নানা সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে চমৎকার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চার দেওয়ালে ল্যাম্পশেডের ভেতর আলো জ্বলছে এখন, সিলিং থেকে বিরাট একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, তার আলো অবশ্য জ্বালানো হয়নি।

বাড়িটা এখন প্রায় ফাঁকাই। রণিতার দাদা পূর্ণেন্দু অয়েল ইণ্ডিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, মাস দুই হল কলকাতা থেকে তাকে বরোদায় বদলি করা হয়েছে, বৌদি বন্দনাও তার সঙ্গে গেছে। বাবা অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি থেকে রিটায়ারমেন্টের পর দুপুরের পর বেশির ভাগ দিনই বাড়িতে থাকেন না; মিটিং সেমিনার, এসব নিয়েই আছেন। আজও তিনি যথারীতি বাড়ি নেই।

রণিতা লক্ষ করল, দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা গদি-মোড়া ইজিচেয়ারে আধশোয়া ভঙ্গিতে খুব মগ্ন হয়ে বই পড়ছেন সুধাময়ী। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। এমন তুলতুলে, নরম মানুষ কচিৎ চোখে পড়ে। এখনও প্রচুর ঘন চুল তাঁর, সময় অবশ্য অদৃশ্য ব্রাশ টেনে তার রং অনেকটাই বদলে দিয়েছে। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য রুপোর তার। এই বয়সেও সুধাময়ীর মুখখানায় অপার্থিব সারল্য মাখানো, নিষ্পাপ কিশোরীর মুখে যেমনটি থাকে। পরনে লাল-পাড় গরদের শাড়ি, গরদেরই ব্লাউজ। কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা। সব মিলিয়ে তাঁকে ঘিরে যেন আশ্চর্য এক দেবীমহিমা।

রণিতা জানে সুধাময়ী কী বই পড়ছেন। রাজশেখর বসু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মূল মহাভারতের ডালপালা ছেঁটে একটা তরতরে চেহারা দিয়েছেন, ইদানীং মনের দিক থেকে সেটাই তাঁর স্টেপল ফুড। এছাড়া মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ বা দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া তো আছেই। আজকাল এই নিয়েই তাঁর নিজস্ব জগৎ।

ইজিচেয়ারের ডান পাশের মেঝেতে বসে কুচি সুপুরি, লবঙ্গ, এলাচ, চুন, খয়ের আর দু-এক টুকরো সুগন্ধি জর্দা দিয়ে ছোট ছোট পানের খিলি তৈরি

করছে মুক্তা। সুধাময়ীর খুব পান-জর্দার নেশা, দিনে কম করে তিরিশ চল্লিশ খিলি পান খান। তার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হয় মুক্তাকে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, মোটামুটি সুশ্রী, বাপ-মা নেই। অল্প বয়সে বিধবা হবার পর ভাইরা দায়িত্ব নিতে চায়নি, নানা জায়গায় ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতে এসে ঠেকেছে। বছর তেরো এখানে আছে, তাকে রণিতাদের বাড়ির একজন পার্মানেন্ট মেম্বারই বলা যায়।

সুধাময়ী তো ছেলেমেয়ে বা স্বামীকে বিশেষ কাছে পান না, যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। একমাত্র মুক্তাই তাঁকে সঙ্গ দেয়। সে তাঁর সর্বক্ষণের সহচরী এবং পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট।

কোনাচেভাবে পায়ে পায়ে সুধাময়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রণিতা। একটু অস্বস্তি হয় তার, কেননা সাতদিন সুধাময়ীর সঙ্গে তার কথা বন্ধ। শেষ পর্যন্ত ডাকতেই হয়, 'মা—'

মহাভারতের পাশ দিয়ে মেয়ের দিকে তাকান সুধাময়ী কিন্তু। কিছুই বলেন না। রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে কে ফোন করেছিল?'

আঙুল বাড়িয়ে টেলিফোন স্ট্যান্ডটা দেখিয়ে দেন সুধাময়ী, পরক্ষণে মহাভারতের আড়ালে তাঁর মুখ অদৃশ্য হয়।

ঠিক বুঝতে না পেরে সুধাময়ীকে ফের ডাকতে যাবে রণিতা, হঠাৎ মুক্তা বলে ওঠে, 'ওখানে যাও ছোটদি, যা জানতে চাইছ ফোনের কাছে সব আছে।'

অর্থাৎ এতক্ষণ নিচে বসে রণিতার কথাগুলো শুনেছে মুক্তা। সুধাময়ী তো মুখ ফুটে কিছু বলবেন না, তাঁর হয়ে উত্তরটা ওকেই দিতে হল।

রণিতা কিন্তু তক্ষুণি ফোনের কাছে যায় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাকে দেখতে থাকে। সুধাময়ী তার ওপর অনেকদিন ধরেই অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। তিনি পুরনো ধ্যান-ধারণার মানুষ। রণিতার চালচলন, পোশাক আশাক, কোনোটাই পছন্দ করেন না। বিশেষ করে সে যে ধরনের কাজকর্ম করে এবং সে জন্য সারা ভারতে টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, এতে ঘোর আপত্তি সুধাময়ীর। এ ব্যাপারে স্বামীর ওপরেও তিনি প্রচণ্ড বিরক্ত। মেয়েদের সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বড় বেশি লিবারেল, স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি একজন বিরাট পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই আশকারায় তাঁদের এই ছোট মেয়েটা একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে।

আসলে সাতাশ পেরিয়ে আটাশ বছরে পড়েছে রণিতা। তার বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন সুধাময়ী। ক'দিন আগে রণিতার ছোট মামা একটা ছেলের খোঁজ এনেছিলেন। পাত্রটি চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট এবং এম বি এ, আপাতত একটা

বড় কোম্পানিতে একজিকিউটিভ, কয়েক মাসের ভেতর আমেরিকায় চলে যাবে। সেখানকার এক ফার্ম তাকে বিশাল অফার দিয়েছে। যাবার আগে মা-বাবা ছেলের বিয়ে দিতে চান। রণিতাকে ওঁরা দেখেছেন, পুত্রবধূ হিসেবে তাকে পেতে খুবই আগ্রহী। কিন্তু রণিতা রাজি হয় নি, হেসে হেসে এমন একটা চমৎকার সম্বন্ধ উড়িয়েই দিয়েছে, জানিয়েছে, কোথাও বাঁধা পড়ার সময় এখনও হয়নি। আগে কেরিয়ার, তারপর অন্য সব। কিন্তু কেউ জানে না, অমিতেশকে সে কথা দিয়ে রেখেছে, সেখান থেকে তার পক্ষে ফেরা আর সম্ভব নয়।

সেই থেকে সুধাময়ী অঘোষিত এক যুদ্ধই শুরু করে দিয়েছেন। রেগে গেলে তিনি চিৎকার টিৎকার করেন না, শুধু কথা বন্ধ করে দেন, তাতেও কাজ না হলে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাবেন না। স্রেফ নির্জলা অনশন। এই নীরব অহিংস প্রতিবাদ এক ধরনের প্যাসিভ রেজিস্টান্স, নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যের নার্ভে এই যে ক্রমাগত চাপ দেওয়া, এটাকে ভীষণ ভয় পায় রণিতা। একবার সে ভাবল মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'রাগ কোরো না মা। তুমি কথা না বললে আমার কত কষ্ট হয়, জানো না?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করল না সে, কিছুই বলল না, সোজা ফোনের কাছে চলে গেল।

ফোন-স্ট্যান্ডে পেপার ওয়েটের তলায় এক টুকরো কাগজ রয়েছে। ঢাউস ব্যাগটা কাঁধ থেকে মেঝেতে নামিয়ে সেটা তুলতেই ক'টা লাইন চোখে পড়ল। গোটা গোটা অক্ষরে মা লিখে রেখেছেন রজনী দু'বার ফোন করেছিল। সে তাদের বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। তুই ফেরামাত্র ফোন করতে বলেছে। লাইনগুলোর নিচে একটা ফোন নাম্বারও লেখা রয়েছে।

কোন রজনী প্রথমটা ধরতে পারল না রণিতা। বম্বেতে আছে রজনী যোশি আর দিল্লিতে রজনী শর্মা। সুধাময়ী লেখেননি, ফোনটা ঠিক কে করেছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কিনা ভাবতে গিয়ে ফোন নাম্বারটার দিকে আবার নজর গেল। আগে ভাল করে লক্ষ করেনি, এখন দেখা গেল ওটা দিল্লিরই নাম্বার। তার মানে রজনী শর্মা।

কয়েকটা বছর পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে দুই রজনী আর রণিতা একসঙ্গে কাটিয়েছে। ওখানকার কোর্স শেষ করার পর তিনজন এখন তিন শহরে। ওদের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই রণিতার। হঠাৎ দিল্লির রজনী কেন ফোন করল, কে জানে!

রণিতা ডায়াল করে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর রজনীকে ধরে ফেলল। কলকাতার লোকাল লাইন ধরতে জিভ বেরিয়ে যায় কিন্তু লং ডিসটান্স লাইনে

কোনোরকম সমস্যা নেই। নেহাত এনগেজড না থাকলে দু-একবার ডায়াল করলেই পাওয়া যায়।

রণিতা বলে, 'হ্যালো রাজু, আমি রণি—' রজনীর ডাক নাম রাজু।

রজনী বলে, 'হাই রণি, দু দু'বার তোকে ফোন করেছিলাম। আন্টি বললেন, বেরিয়েছিস, কখন ফিরবি ঠিক নেই!'

'ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম, কিছু নোট নেবার দরকার ছিল। কেমন আছিস বল—'

'ফাইন। আমি কখনও খারাপ থাকি না। এভার চিয়ারফুল। তোর খবর কী?'

রজনী খুবই টগবগে ছটফটে আমুদে ধরনের মেয়ে, দারুণ উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সেটা তার কাছে আসামাত্র টের পাওয়া যায়। পুনেতে ক'টা বছর ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসটাকে সে মাতিয়ে রেখেছিল।

রণিতা বলে, 'চলে যাচ্ছে। তারপর বল ফোন করেছিলি কেন?' আসলে ফোনের কারণটা জানার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল তার।

মজার গলায় রজনী বলে, 'বোলুঙ্গি বাবা, বোলুঙ্গি। দু'মিনিটের জন্যে ধৈর্য ধর! ওনলি টু মিনিটস। আগে বল বাড়ির কে কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'তোর কাজটাজ কেমন চলছে?'

'নট ব্যাড। দার্জিলিংয়ের টি গার্ডেনগুলোর ওপর চল্লিশ মিনিটের একটা ডকুমেন্টারি করলাম। শুটিং শেষ হয়েছে, এডিটিং চলছে। এরপর ভাবছি মধ্যপ্রদেশের মারিয়া ট্রাইবের ওপর একটা ছবি করব। তার জন্যে কিছু মেটিরিয়াল জোগাড় টোগাড় করছি।'

'ভেরি গুড।'

'তুই কী করছিস?'

'তিনটে বিগ কর্পোরেট হাউসের অ্যাড করছি। কম লেবার, অনেক টাকা। তুই যদি করতে চাস বল, অ্যাড-এর কাজ পাইয়ে দিতে পারি।'

'এখন ইচ্ছে নেই। পরে যদি ভাবি তোকে জানাব।'

রজনী বলে, 'ওকে ওকে। দু'মিনিট হয়ে গেছে। এবার শোন, তোর জন্যে একটা দারুণ সুখবর আছে, এক্সট্রিমলি গুড নিউজ।'

'এক্সট্রিমলি' শব্দটার ওপর এমন জোর দেয় রজনী যে শিরদাঁড়া টান টান করে বসে রণিতা। বলে, 'কী খবর রে?'

'কাল মাণ্ডি হাউস-এ আমার একটা টেলিফিল্মের ব্যাপারে গিয়েছিলাম। তখন তোর প্রোপোজালগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিলাম—'

রণিতার মনে পড়ে মাস ছয়েক আগে সে দুটো টেলিফিল্ম এবং দুটো ডকুমেন্টারি বা তথ্যচিত্রের স্ক্রিপ্ট জমা দিয়েছিল। রজনীকে বলে এসেছিল, মাঝে মাঝে গিয়ে যেন ওগুলো সম্পর্কে খবর টবর নেয়—অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যাবে কিনা, পেলে কতদিন লাগবে, ইত্যাদি। রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী বললেন ওঁরা?'

রজনী বলে, 'ওগুলো যেমন দিয়েছিলি তেমনি পড়ে আছে অ্যান্ড অ্যাজ ইয়ুজুয়াল গ্যাদারিং ডাস্ট। তবে ওঁদের দিক থেকে একটা অফার দিয়েছেন।'

'কী অফার?'

'ওঁরা তোকে দিয়ে একটা ডকু-ফিচার করাতে চান।'

গত তিন বছরে ডকুমেন্টারি ছবি করে দেশের তো বটেই, বাইরেও কম করে সাত আটটা পুরস্কার পেয়েছে রণিতা। সে যে আর সব তথ্যচিত্র-করিয়েদের থেকে আলাদা, তার দেখার চোখ, ক্যামেরার ব্যবহার, ছিমছাম এডিটিং ডকুমেন্টারিগুলোকে যে শিল্পের স্তরে তুলে নিয়ে যায়, এ নিয়ে কাগজে কাগজে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে। মাণ্ডি হাউস তার সম্বন্ধে সব খবরই রাখে।

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কিসের ডকু-ফিচার? সাবজেক্টটা কী?'

'নয়নতারা।'

'নয়নতারা? আই মিন—'

রজনী বলে, 'ইয়া বাবা, ইন্ডিয়ান স্টেজ আর স্ক্রিনের লিজেন্ডারি নায়িকা— লাস্ট পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যাঁর মতো আর্টিস্ট আর আসেনি।'

কথাটা ঠিকই বলেছে রজনী। বাংলা সিনেমা আর নাটকে মূলত অভিনয় করলেও নয়নতারা হিন্দি ছবি আর নাটকও করেছেন প্রচুর। এর প্রায় সবগুলোই সারা দেশকে তোলপাড় করে দিয়েছে। চার চারবার উর্বশী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, বিদেশের কয়েকটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট অ্যাকট্রেস হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন, অসামান্য শিল্পী হিসেবে দেওয়া হয়েছে পদ্মভূষণ খেতাব। সারা দেশ জুড়ে তাঁর অজস্র অনুরাগী, কত যে ফ্যান-ক্লাব নয়নতারার নামে তৈরি হয়েছে তার হিসেব নেই। বিপুল জনপ্রিয়তা এবং মর্যাদা দুই-ই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ছবি করা অকল্পনীয় ব্যাপার।

রণিতা হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলে, 'ইমপসিবল রাজু, অ্যাবসোলুটলি ইমপসিবল।'

রজনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হোয়াই? তোর মতো ডেয়ারিং ডেসপারেট মেয়ের কাছে এমন একটা শব্দ এক্সপেক্ট করিনি।'

রজনীর মতো হৈ-হুল্লোড় করতে না পারলেও রণিতা ভীষণ জেদি, প্রচণ্ড একরোখা আর সাহসী। কিছু একটা মাথায় চাপলে সেটা না করে ছাড়ে না। ভারতবর্ষের নানা দুর্গম জায়গায় ঘুরে ঘুরে এমন জটিল, দুরূহ সব বিষয় নিয়ে সে ছবি করেছে, মেয়েরা তো বটে, অনেক পুরুষ ফিল্মমেকারও তা ভাবতে পারে না।

রণিতা বলে, 'কেন অসম্ভব, জানিস না। আট বছর আগে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মিডিয়ার লোকেরা পাগলের মতো তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। তাঁকে নিয়ে ছবি করব অথচ তিনিই থাকবেন না, এটা তো হতে পারে না।'

'অফ কোর্স। ওঁকে খুঁজে বার কর। আর দেরি করলে ইট উড বি টু লেট। অন্য কান্ট্রি হলে এতদিনে ওঁর ওপর পঁচিশটা ডকুমেন্টারি হয়ে যেত। শোন, টাকাটা কোনো ফ্যাক্টর নয়, নয়নতারাকে নিয়ে লন্ডন কি নিউইয়র্কে শুটিং করলেও ওঁরা সব খরচ দেবেন। মোটামুটি একটা বাজেট তৈরি করে দিন পনেরো পর দিল্লি চলে আয়।'

একটু ভেবে রণিতা বলে, 'ছবিটা তুইই কর না।'

রজনী বলে, 'আরে বাবা, বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজটা কি আমি ভাল জানি? উনি বেশির ভাগ কাজই করেছেন বাংলা ফিল্ম আর স্টেজে। ল্যাংগুয়েজ না জানলে ফাইনার ব্যাপারগুলো ধরব কী করে?'

'কিন্তু—'

'কিন্তু ফিন্তু না, ইট'স আ চ্যালেঞ্জিং জব। এটা তোকে করতেই হবে। দ্যাট গ্রেট লেডি, নয়নতারা রায়, কিভাবে স্টেজ আর ফিল্ম অ্যাক্টিংয়ে এলেন, কে বা কারা তাঁকে ইন্সপায়ার করেছে, কেমন ছিল তাঁর ডে-টু-ডে লাইফ, কেনই বা তিনি হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে নিরুদ্দেশ হলেন, এর সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন হিসেবে যে সব ছবিতে আর নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন তার কিছু ক্লিপিং জুড়ে দিতে পারলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে।'

রণিতা উত্তর দেয় না।

রজনী থামেনি, 'শুনেছি, ওঁর পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড অশান্তি ছিল। অনেকে ওঁর ক্ষতি করতে চেয়েছেন। ওঁকে নিয়ে এক সময় থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান স্ক্যান্ডাল রটেছে। সব বাধা পার হয়ে কিভাবে আজকের এই হাইটে উঠেছেন, এগুলোও ছবিটায় থাকা চাই।'

রজনী নানাভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চাইছে কিন্তু রণিতার সংশয় কিছুতেই কাটছে না। সে বলে, 'তা তো চাই। তবে—'

তার কথা কানেও তোলে না রজনী। নন-স্টপ টকিং মেশিনের মতো একটানা বলে যায়, আমাদের ইন্ডিয়ানদের মতো এমন ক্যালাস, ইনডিফারেন্ট জাত হোল ওয়ার্ল্ডে আর দ্বিতীয়টি নেই। এত বড় একজন আর্টিস্ট সম্বন্ধে এখনই যদি কিছু করে না রাখি ফিউচার জেনারেশন আমাদের গায়ে থুতু দেবে।' একটু থেমে দম নিয়ে ফের শুরু করে, 'আমরা হয়তো কিছু করলাম না কিন্তু দেখবি হুট করে ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে কেউ এসে কাজটা করে ফেলল। দে আর মাচ মোর এন্টারপ্রাইজিং। তখন আর কারো কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আ শেম ফর অল অফ আস।'

'সবই বুঝলাম কিন্তু নয়নতারাকে পাচ্ছি কোথায়?'

'এনিহোয়ার ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ। চারদিক চষে ফেল। মৃত্যুর খবর যখন এতদিন পাওয়া যায়নি তখন কোথাও না কোথাও তিনি আছেন।'

রণিতা কিছু বলে না।

আচমকা যেন সব মুশকিলের আসান হয়ে গেছে এমন উল্লসিত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে রজনী, 'আরে বাঃ, তোর হাতে এমন একটা সুপার হিরো রয়েছে। ওই শালেকে নয়নতারার পেছনে লাগিয়ে দে। কাম হো যায়েগা।' বলে গলা নামিয়ে অতীব মধুর স্বরে ক'টি চোস্ত ইংরেজি খিস্তি আওড়ায়। সেগুলো অশ্লীল হলেও বেশ মুখরোচক।

রজনীর মুখে কিছুই আটকায় না। হিন্দি বাংলা ইংরেজি গুজরাটি মারাঠি সিন্ধি, মোট কথা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যতগুলো চালু ভাষা আছে তার বাছা বাছা কিছু গালাগাল তার কণ্ঠস্থ। চার অক্ষরের একটা অস্বস্তিকর ইংরেজি শব্দ আকছার তার মুখে শোনা যায়। পুনেতে কোর্স করার সময় বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে এখনকার ফ্রি সেক্স নিয়ে ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে এমন হৈ চৈ বাধিয়ে দিত যে রণিতার মতো স্মার্ট মেয়েরও কান লাল হয়ে উঠত।

সুপার হিরো বা শালেটা কে বুঝতে না পেরে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কার কথা বলছিস?'

'তোর সেই ব্লাডি হেল বয়ফ্রেন্ড—ওই যে নিউজপেপারের রোভিং রিপোর্টার। কী যেন নাম? কী যেন—'

এবার বোঝা গেল, অমিতেশের কথা বলছে রজনী। রণিতা যখন ফার্স্ট ইয়ারে, অমিতেশের তখন থার্ড ইয়ার। প্রেমটা ওই কলেজের সময় থেকেই। পুনেতে যাবার পর রজনীর সঙ্গে যখন দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল, একদিন সারা রাত ধরে ওরা একজন আরেক জনকে তাদের প্রেমের গল্প শুনিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে,

অমিতেশের কথা রজনী ভোলেনি। রণিতাও মনে রেখেছে, একটি সিন্ধি যুবক, নাম কমল শিবদাসানি, কয়েক বছর ধরে রজনীর জন্য অপেক্ষা করে আছে। রণিতার মতো রজনীরও ধনুর্ভাঙা পণ, চোখ-ধাঁধানো কেরিয়ার না করা পর্যন্ত বিয়ে নয়।

রণিতা বলে, 'ওর নাম অমিতেশ—'

রজনী বলে, 'রাইট। বুঝলি রণি, রিপোর্টাররা হল একেকটা শার্লক হোমস কি হারকুল পয়রোর বাচ্চা। তোর ওই হারামজাদে ব্লাড-হাউন্ডের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক নয়নতারার কাছে পৌঁছে যাবে। লাভারের জন্যে লোকে লাইফ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, আর এ তো একজন মহিলাকে খুঁজে বার করা। আজই ওর সঙ্গে কথা বলে নিবি। কী হল না হল, আমাকে তাড়াতাড়ি জানাস।'

'আচ্ছা—'

'এখন ছাড়ছি। ভেরি গুড় লাক অ্যান্ড গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

দুই

রণিতার মধ্যে একটি বেপরোয়া, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মেজাজ রয়েছে। সেটাকে উসকে দিল রজনী। প্রাথমিক দ্বিধা এবং সংশয় কাটিয়ে সে ঠিক করে ফেলে নয়নতারাকে নিয়ে ডকু-ফিচারটা করতেই হবে। হঠাৎ তার আবছাভাবে মনে পড়ল, ওঁকে নিয়ে আগেও দু-একজন ছবির কথা ভেবেছিল কিন্তু বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেনি। অন্যেরা পারেনি বলে সে পারবে না, এমন কোনো কথা নেই। অন্তত চেষ্টা সে করে যাবে, তারপর দেখা যাক কত দূর কী হয়।

অমিতেশের ব্যাপারে রজনী খুব দামি একটা পরামর্শ দিয়েছে। নয়নতারাকে খুঁজে বার করতে হলে ওকে সবার আগে দরকার। তাছাড়া প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্যও ভীষণ জরুরি, অমিতেশ পাশে না থাকালে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়।

আসলে নয়নতারার বেশ কিছু ফিল্ম দেখলেও তাঁর জীবন সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে তেমন কিছু জানে না রণিতা। অথচ সলিড, সত্য কিছু ঘটনা জানা না থাকলে ডকু-ফিচারটা সাজাবে কী করে?

রণিতার মনে আছে, নয়নতারা যখন অভিনয়ের জগৎ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন তখন সবে এ দেশে টিভি এসেছে। আকাশবাণী বা দূরদর্শনের কোনো প্রোগ্রামে তাঁকে দেখা গেছে কি? কখনও কি টিভিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন? রণিতার মনে পড়ে না। যদি দিয়েও থাকেন, তার জানা নেই। অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়ার কাছ থেকে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবু আকাশবাণী আর দূরদর্শন ভবনে গিয়ে সে খোঁজ নেবে।

নয়নতারার ব্যাপারে তাকে অনেকখানি নির্ভর করতে হবে প্রিন্ট মিডিয়ার ওপর। রণিতা জানে, নয়নতারার জীবন এবং অভিনয় নিয়ে গত চল্লিশ বছর ধরে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনগুলোতে। শুধু চকচকে রঙিন সিনেমা ম্যাগে নয়, নাক-উঁচু বিখ্যাত সব লিটল ম্যাগাজিনেও। এখনও, তাঁর নিরুদ্দেশ হবার এত বছর বাদেও তাঁর সম্বন্ধে মানুষের বিপুল আগ্রহ। ফিল্ম এবং স্টেজ সম্পর্কে কোথাও কোনো লেখা বেরুলে নয়নতারা প্রসঙ্গ এসে যাবেই।

অমিতেশদের দৈনিক 'দিনকাল'-এর অফিসে চমৎকার একটা লাইব্রেরি আছে। সেখানে ওদের কাগজ তো বটেই, অন্য সব বড় বড় ডেইলিরও পঞ্চাশ বছরের ফাইল যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর আছে অসংখ্য নাম-করা ম্যাগাজিন আর নানা বিষয়ের ওপর দামি দামি রেফারেন্সের বই। নয়নতারা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করার জন্য এইসব পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু লাইব্রেরি শুধুমাত্র 'দিনকাল'-এর স্টাফের জন্য, সেখানে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এডিটরের কাছ থেকে রণিতার জন্য 'স্পেশাল পারমিশান' এনে ওখানে কাগজপত্র দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারে অমিতেশই। এর আগেও কয়েক বার করে দিয়েছে। দু'তিনটে ডকুমেন্টারির জন্য নানা দৈনিকের পুরনো কিছু রিপোর্ট দরকার হয়েছিল তার।

রজনী লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরও কিন্তু ফোন-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রণিতা। নয়নতারার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকবার পর ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা টের পাচ্ছে সে। আর কোনো কিছু তার মাথায় চাপলে শুরু না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। অস্থিরতা এবং টেনশন ক্রমশ বাড়তেই থাকে। এখনই অমিতেশের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ডায়াল করে রণিতা 'দিনকাল'-এর রিপোর্টিং সেকশানটা ধরে ফেলল কিন্তু অমিতেশকে পাওয়া গেল না।

ওধারে ফোনটা ধরেছিল অমিতেশের কলিগ এবং প্রিয় বন্ধু মৃণাল। রণিতাকে সে খুব ভালই চেনে। বলল, 'ফরাক্কায় আজ সকালে একটা মারাত্মক বাস

অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। দশজন স্পট ডেড। কত জখম হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায়নি, ওদের ভেতর কয়েকজনের অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল। খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে চিফ রিপোর্টার অমিতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওর ফিরতে অনেক রাত হবে।'

অমিতেশের বন্ধু হিসেবে মৃণালের সঙ্গে রণিতার সম্পর্কটা বেশ মধুরই বলা যায়। মৃণাল দারুণ মজাদার মানুষ, রঙ্গপ্রিয়। খানিকটা ফাজিল ধরনের। তবে ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র মালিন্য নেই। তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে মন ভাল হয়ে যায়। মৃণাল আর রণিতা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে।

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'অমিতের সঙ্গে আজ কি তোমার দেখা হতে পারে?'

মৃণাল বলে, 'আমি এগারোটা পর্যন্ত অফিসে আছি। তার ভেতর এলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। কী ব্যাপার? এনিথিং ভেরি আর্জেন্ট?'

'হ্যাঁ। ওকে বলো, কাল সকালে আমাকে যেন ফোন করে।'

'বলব।'

'যদি দেখা না হয় আমার নাম করে একটা মেসেজ রেখে দিও।'

মৃণাল বলে, 'রাখব। তারপর ম্যাডাম—'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

আচমকা গলার স্বর পালটে ফিচেল স্বরে মৃণাল বলে, 'কেন অমিতকে এত ভোগাচ্ছ?'

অবাক হয়ে রণিতা বলে, 'ভোগাচ্ছি! তার মানে?'

'সিম্পল। অমিত আর আমি একই ইয়ারে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছি, একই দিনে 'দিনকাল'-এ ঢুকেছি। দেখ এর ভেতর আমার বিয়ে হয়ে গেছে। নাউ আই অ্যাম আ প্রাউড ফাদার অফ থ্রি কিডস। তার মধ্যে দুটো আবার যমজ—টুইন। রেসে অমিত আমার থেকে ক'ফার্লং পিছিয়ে পড়ল, একবার ভাবো। এ শুধু তোমার জন্যে—'

'আমার জন্যে!'

'নয় তো কী। তুমি করুণা করলে ওর নামটা 'ম্যারেড'দের লিস্টে উঠে যেত। এতদিনে দু-চারটে ইন্ডিয়ান সিটিজেন কি আর ও পয়দা করতে পারত না?'

রণিতা ধমকে ওঠে, 'একদম অসভ্যতা করবে না।'

নিপাট ভালমানুষের গলায় মৃণাল বলে ওঠে, 'অসভ্যতা অবার কী! ইট'স আ রিয়ালিটি অফ লাইফ। অমিত মা-বাবার একই ছেলে। ওর বিয়ে না হলে ওদের বংশের দফা রফা। শাস্ত্রে লেখা আছে বংশরক্ষা না করলে নরকে যেতে হয়। তুমি ওকে মহাপাপ থেকে বাঁচাও ম্যাডাম।'

'আবার ফাজলামো! এই আমি ফোন রাখছি।' কিন্তু রাখতে গিয়েও হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় রণিতা বলে, 'আচ্ছা, তুমি একবার বলেছিলে না তোমার কে একজন রিলেটিভ আছেন যিনি ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত।'

মৃণাল বলে, 'হ্যাঁ, আমার বড়মামা মণিময় চ্যাটার্জি। উনি 'মর্নিং স্টার' কাগজের সিনেমা এডিটর ছিলেন।'

'ছিলেন মানে?'

'ওটা পাস্ট টেন্স, এখন আর নেই। বছর সাতেক হল রিটায়ার করেছেন।'

'উনি নিশ্চয়ই ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের অনেক খবর রাখেন?'

'রাখেন কী বলছ! বড়মামা সিনেমার এনসাইক্লোপিডিয়া। হিরো-হিরোইন থেকে ডিরেক্টর, টেকনিশিয়ান, প্রোডিউসার, এমন কি ফালতু এক্সট্রাদের নামধাম ওঁর মুখস্থ। দিনের পর দিন পাবলিসিটি দিয়ে, ভাল ভাল লিখে কত অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসকে ফেমাস করে দিয়েছেন তার হিসেব নেই।'

'উনি নিশ্চয়ই নয়নতারাকে চিনতেন?'

'নয়নতারা, মানে লিজেন্ডারি স্টেজ অ্যান্ড ফিল্ম অ্যাকট্রেসের কথা বলছ?'

'রাইট।'

'শুধু চেনেন! ওঁর কেরিয়ারের শুরুতে বড়মামা যেভাবে হেল্প করেছেন ভাবতে পারবে না। মণিময় চ্যাটার্জি সেই সময় ছিলেন নয়নতারার গডফাদার।'

খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠে রণিতা। বলে, 'তোমার বড়মামার কাছে নয়নতারা সম্পর্কে তা হলে অনেক কিছু জানা যাবে।'

'আশ্চর্য।'

'কিসের আশ্চর্য?'

মৃণাল জিজ্ঞেস করে, 'হঠাৎ নয়নতারাকে নিয়ে খেপে উঠলে কেন?'

রণিতা বলে, 'দরকার আছে, পরে শুনো। তোমার বড়মামার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারবে?'

তরল গলায় মৃণাল বলে, 'তোমার যখন হুকুম, পারতেই হবে। তবে—'

'কী?'

'বড়মামার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বয়স হয়েছে তো, তার ওপর তিন মাস আগে হার্টে একটা ম্যাসিভ অ্যাটাকও হয়ে গেছে। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলা ডাক্তারের বারণ।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ওঁকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

'আমি বড়মামাকে ফোন করে জেনে নেব কবে গেলে ওঁর অসুবিধা হবে না। টাইম আর ডেট ঠিক করে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

খুব আন্তরিক গলায় রণিতা বলে, 'মেনি, মেনি থ্যাংকস। এখন তা হলে ছাড়ি?'

মৃণাল বলে, 'ওকে ম্যাডাম—'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ঘুরে একবার হল-ঘরের দূর প্রান্তে তাকায় রণিতা। সেখানকার দৃশ্যাবলীর কোনোরকম পরিবর্তন হয়নি। সুধাময়ী তখনকার মতোই মহাভারতে নিমগ্ন হয়ে আছেন, আর মুক্তা ক্ষিপ্র হাতে পান সেজে যাচ্ছে।

এক পলক ওদের দেখে ব্যাগটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে, মুখ ফিরিয়ে হল-ঘরটা কোনাকুনি পার হয়ে নিজের ঘরে চলে আসে রণিতা।

এ বাড়ির অন্য বেড-রুমগুলোর মতো এই ঘরটাও বিশাল, বিশ ফিট বাই পনেরো ফিট। খাট, আলমারি, বইয়ের র‍্যাক, ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবল, সোফা, পড়ার টেবল, ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো। শুধু বাইরের হল-ঘরই না, এ ঘরেও ক্যাবিনেট বোঝাই নানা ফিল্ম আর গানের ক্যাসেট। একটা পোর্টেবল ফরেন টিভি আর টু-ইন-ওয়ানও রয়েছে।

ব্যাগটা একটা সোফায় রেখে, আলো জ্বেলে ফ্যান চালিয়ে দেয় রণিতা। তারপর জুতো খুলে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

বাড়ির কুক দশরথ এই সময় এক কাপ কড়া ব্ল্যাক কফি আর কিছু চিজ-বিস্কিট নিয়ে আসে। সে টের পেয়েছিল রণিতা ফিরে এসেছে।

দশরথের বয়স ষাটের কাছাকাছি কিন্তু এখনও পেটানো মজবুত চেহারা, প্রায় চল্লিশ বছর তার এ বাড়িতে কেটে গেল। রণিতাদের তিন ভাইবোনকে সে জন্মাতে দেখেছে। কখন কার কী দরকার সে জানে এবং নীরবে, অত্যন্ত মসৃণ নিয়মে সে সব জোগান দিয়ে যায়।

রণিতা উচ্ছ্বাসের গলায় বলে, 'দশরথদা, তুমি একজন দারুণ থট-রিডার। মনে মনে এখন এক কাপ কফি চাইছিলাম। বাঁচালে—'

দশরথ কথা খুব কম বলে। নিঃশব্দে হেসে একটা নিচু টিপয় টেবল খাটের কাছে টেনে এনে তার ওপর কফির কাপ টাপ রেখে চলে যায়।

আগস্ট মাস শেষ হয়ে এসেছে। বর্ষা এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি, আকাশে সেই বিকেল থেকে অল্প অল্প মেঘ জমতে শুরু করেছে। তবে সারাদিনে আজ একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। হয়তো বেশি রাতের দিকে হবে। মাঝে মাঝে পুব থেকে দক্ষিণে আড়াআড়ি বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

কফিটা খেয়ে দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ শোনে রণিতা। তারপর একটা রঙিন বারমুডা

প্যান্ট আর ঢোলা শার্ট হাতে ঝুলিয়ে অ্যাটাচড টয়লেটে ঢুকে যায়। শাওয়ার খুলে স্নান টান সেরে, পোশাক পালটে বেডরুমে এসে, চুলটুল আঁচড়ে ফের শুয়ে পড়ে।

ক্যাসেট এখনও বেজে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে রণিতার দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

তিন

ঘুমটা ভাঙে অনাথের ডাকাডাকিতে, 'ছোটদিদি, ওঠো ওঠো। খাবে না? বড়বাবু আর মা তোমার জন্যে বসে আছেন।'

ধড়মড় করে উঠে পড়ে রণিতা, তারপর অনাথের সঙ্গে নিচে নামতে নামতে হল-ঘরের বড় ওয়াল ক্লকটায় দেখতে পায় এখন দশটা বেজে চল্লিশ।

এ বাড়ির রেওয়াজ হল রাতের খাওয়াটা সবাই একসঙ্গে বসে খায়। বিয়ের আগে রণিতার দিদি শমিতার প্রথমে কলেজ, পরে ইউনিভার্সিটিতে ছোটার ব্যাপার ছিল, রণিতারও তাই। দাদা পূর্ণেন্দুর ছিল অফিস, বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস। পূর্ণেন্দু ছাড়া অন্য কারো বেরুবার নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কেননা রোজ একই সময়ে ওদের ক্লাস শুরু হত না। একেক জন একেক সময় খেয়ে বেরুত। রণিতার বাবা ইন্দ্রনাথ মনে করেন, দিনে অন্তত একবার বাড়ির সকলের একসঙ্গে বসা দরকার। এতে পারিবারিক সম্পর্কটা অনেক নিবিড় হয়। সেই জন্যই সবাই মিলে রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা।

রণিতাদের খাওয়ার ঘরটা একতলায়। সেখানে আসতে দেখা যায়, ইন্দ্রনাথ আর সুধাময়ী ডাইনিং টেবলে বসে আছেন। এই ঘরটা আর কিচেনের মাঝখানে একটা দরজা, সেখানে দাঁড়িয়ে মুক্তা। দশরথই সবাইকে খেতে দেয়, মুক্তা এটা সেটা এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করে।

ইন্দ্রনাথের বয়স সাতষট্টি। পাতলা মেদহীন চেহারা, লম্বাটে মুখে বুদ্ধির ধার। এই বয়সেও মেরদণ্ড টান টান, চুলও খুব বেশি পাকেনি। চওড়া কপাল, ঈষৎ পুরু ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি শান্ত কিন্তু দূরভেদী। গায়ের রং একসময় ছিল টকটকে, বয়স তার উজ্জ্বলতা অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে। হালকা মলিন ছায়া পড়েছে ইন্দ্রনাথের ওপর।

হঠাৎ দেখলে তাঁকে খুব রাশভারী মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ করলে টের পাওয়া যাবে গাম্ভীর্যটা বাইরের খোলস মাত্র। তাঁর মধ্যে এমন একটি পরিহাসপ্রিয়

মানুষ রয়েছে যে চারপাশের রুক্ষ কর্কশ আবহাওয়া থেকে আনন্দ আর মজাকে ছেঁকে বার করে নিতে পারে।

ইন্দ্রনাথ ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে সোসিওলজির দুর্ধর্ষ অধ্যাপক। শুধু সমাজতত্ত্ব নয়, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব অর্থনীতি নৃতত্ত্ব ভারতীয় দর্শন, এমন কি সিনেমা নাটক ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর বিপুল আগ্রহ এবং অগাধ পড়াশোনা। এত পাণ্ডিত্য তাঁকে শুকিয়ে কাঠ করে দেয়নি। সব বয়সের মানুষের সঙ্গে তিনি অবাধে মিশতে পারেন, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুর মতো।

ইন্দ্রনাথ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলাম বাড়ি ফিরে তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস। শরীর খারাপ নাকি?'

রণিতা অল্প হেসে জড়ানো গলায় বলে, 'না বাবা, স্নানটান করে একটু শুয়েছিলাম। কখন ঘুম এসে গেছে, টের পাইনি।'

'এখনও ঘুম ভাবটা রয়েছে। যা, চোখে জল দিয়ে আয়।'

ডাইনিং রুমের একধারে দুধসাদা বেসিন। পাশেই একটা র‍্যাকে তোয়ালে, লিকুইড সোপ, ইত্যাদি।

ট্যাপ খুলে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই আচ্ছন্নতা কেটে যায়। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ইন্দ্রনাথের পাশে এসে বসে রণিতা। সঙ্গে সঙ্গে প্লেটে প্লেটে খাবার সাজিয়ে সবাইকে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে দশরথ। রণিতাদের আরো কিছু দরকার হলে দেবে।

দিনের বেলা তাড়াহুড়ো করে খেয়ে সবাই বেরিয়ে যায়। কিন্তু ডিনারটা ওরা করে ধীরেসুস্থে, অনেকটা সময় নিয়ে। এই রাত্রিবেলায় তো আর ব্যস্ততা থাকে না, সকলেই তখন চাপ-মুক্ত, ঢিলেঢালা মেজাজে থাকে।

পূর্ণেন্দু, তার স্ত্রী বন্দনা আর শমিতারা যখন ছিল, আসর দারুণ জমে উঠত। সারাদিন কে কী করেছে, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কোথায় গেছে, সবাই তা জানাতো। শুধু তাই না, দেশের রাজনৈতিক হালচাল, শেয়ার কেলেঙ্কারি, বেকারিত্ব, বম্বে ব্লাস্ট, অযোধ্যা, ফুটবল, ক্রিকেট— যাবতীয় বিষয় নিয়ে তারা বাড়ি সরগরম করে তুলত। পূর্ণেন্দুরা চলে যাবার পর আড্ডা আর তেমন হয় না। সুধাময়ী বরাবরই স্বল্পভাষী, বলার চেয়ে তিনি শোনেন বেশি। আজকাল রণিতার বিয়ের ব্যাপারে তিনি এমনই ক্ষুব্ধ যে প্রায় সারাক্ষণই মুখ বুজে থাকেন। গল্প যা করার রণিতা আর ইন্দ্রনাথই করেন।

খেতে খেতে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার না আজ সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবে একটা সেমিনার ছিল?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ।'

'বিষয়টা যেন কী?'

'বাঃ, কালই তো তোকে বললাম। ভুলে গেছিস? সাবজেক্টটা হল নারী-নির্যাতন।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কেমন হল তোমাদের সেমিনার?'

ইন্দ্রনাথ নিরুৎসুক সুরে বললেন, 'ভাল না। এসব যেন কিছু একটা করতে হয় তাই করা। অ্যাবসোলুটলি মেকানিক্যাল। নাম-করা জার্নালিস্ট, অধ্যাপক, সোসাল ওয়ার্কার, পুলিশের বড় কর্তা, পলিটিক্যাল নেতারা এলেন। মেয়েদের ওপর যে ক্রাইম চলছে, সে সম্বন্ধে লম্বা লম্বা ভাষণ দিলেন কেউ কেউ, কেউ পেপার পড়লেন। এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা হল। বাস এই পর্যন্ত।'

রণিতা বাবাকে লক্ষ করতে লাগল, কিছু বলল না।

ইন্দ্রনাথ থামেননি, 'বুঝলি ছোট খুকি, এভাবে এয়ার-কনডিশানড অডিটোরিয়ামে সেমিনার করে, দামি লাঞ্চ খেয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। উই শ্যাল হ্যাভ টু ডু সামথিং পজিটিভ, ফিল্ডে নেমে যেতে হবে। যে মেয়েরা টরচারড হচ্ছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সব রকম সাহায্য দিতে হবে—লিগ্যাল, মোরাল অ্যান্ড মনেটারি। কিভাবে এটা করা যায়, ভেবে দেখব। তারপর খুব তাড়াতাড়ি কাজে নামব। সে যাক, তোর তো আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবার কথা ছিল। গিয়েছিলি?'

আস্তে মাথা নাড়ে রণিতা—গিয়েছিল।

'দণ্ডকারণ্যের যে ট্রাইবটা নিয়ে কাজ করবি, তাদের সম্বন্ধে কিছু মেটিরিয়াল পাওয়া গেল?'

'প্রচুর।' রণিতা বলে, 'কিন্তু বাবা, ওই ডকুমেন্টারিটা এখন আমি করছি না।'

অবাক হয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'কেন রে?'

'ওটার আগে আমাকে অন্য একটা ডকু-ফিচাব করে নিতে হবে।'

'বিষয়টা কী?'

নয়নতারার কথা বলে রণিতা।

ইন্দ্রনাথ সোজা হয়ে বসেন। বলেন, 'খুব ভাল সাবজেক্ট। এটা তোর মাথায় এল কী করে?'

রজনীর সঙ্গে সন্ধেবেলায় ফোনে যে সব কথা হয়েছে মোটামুটি সব জানিয়ে রণিতা বলে, 'করতে পারলে দারুণ একটা ব্যাপার হয়, তাই না বাবা?'

বেশ জোর দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই। কাজটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। ভদ্রমহিলার বহুদিন খোঁজ নেই। তাঁকে ছাড়া ছবিটা কিন্তু হতে পারে না।'

আস্তে মাথা নাড়ে রণিতা।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'কিভাবে এগুবি, কিছু ভেবেছিস?'

রণিতা জানায় এই সবে রজনীর কাছ থেকে দূরদর্শনের অফারটা পেয়েছে। এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে উঠতে পারেনি। তবে প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্য নেবে, মণিময় চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করবে, সেই সঙ্গে নয়নতারার সন্ধানও চালিয়ে যাবে। অমিতেশের নামটা অবশ্য করে না। আপাতত সেটা স্থগিত রইল, তবে মা যেভাবে তার বিয়ের ব্যাপারে অস্থির হয়ে উঠেছেন, ইন্দ্রনাথকে খুব তাড়াতাড়িই জানাতে হবে। রণিতার ধারণা, বাবা অমত করবেন না এবং সুধাময়ীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অমিতেশের ব্যাপারে রাজি করাতে পারবেন।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ, এটাই কারেক্ট ওয়ে। শুধু মণিময় চ্যাটার্জির সঙ্গে না, নয়নতারা যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সেই কো-অ্যাক্টররা, তাঁর ছবির প্রোডিউসার, ডিরেক্টর, আর্ট ডিরেক্টর, মেকআপ-ম্যানদের অনেকেই বেঁচে আছেন। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। ওঁরা অনেক মেটিরিয়াল দিতে পারবেন।'

উৎসুক সুরে রণিতা বলে, 'তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আর কী কী করা যায়, তুমি একটু চিন্তা কোরো।'

'অবশ্যই।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় খুব উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন ইন্দ্রনাথ, 'জানিস তো, নয়নতারা স্টেজ অ্যাক্টিংয়ে নতুন স্টাইল নিয়ে এসেছিলেন।'

'শুনেছি। কিন্তু ওঁর নাটক দেখার সুযোগ পাইনি।'

'কী করে দেখবি! নয়নতারা যখন স্টেজ ছেড়েছেন তখন তোর বয়েস আর কত, খুব বেশি হলে বারো তেরো। ওই বয়েসে নাটক টাটক সম্পর্কে তোর ইন্টারেস্ট গ্রো করেনি।'

রণিতা কিছু না বলে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'যতটা মনে আছে, নয়নতারা সবসুদ্ধু কুড়ি বাইশটা নাটকে অভিনয় করেছিলেন। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক, নাম রমেন লাহা, এর মধ্যে চোদ্দ পনেরোটা প্রোডিউস করেছেন। উনি বেঁচে থাকলে নয়নতারা সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবি।'

রণিতা বলে, 'কাল রমেনবাবুর খোঁজ করবে?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'করব। 'মুনলাইট থিয়েটার' হলটা ওঁদেরই। ওখানে ফোন করলে জানা যাবে।'

ইন্দ্রনাথের কথা শেষ হতে না হতেই ডাইনিং রুমে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মাত্র পাঁচ ফুট দূরত্বে বসে নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিলেন সুধাময়ী। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নাচাও নাচাও, যত পার মেয়েকে নাচিয়ে যাও।'

খুব ধীর, নিমগ্ন গলায় কথা বলেন সুধাময়ী। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর স্বর কয়েক পর্দা উঁচুতে উঠেছে, উত্তেজনায় রন রন করছে। রাগে মুখ থমথমে।

সুধাময়ীর এমন চেহারা আগে আর দেখা যায়নি। রণিতারা হকচকিয়ে যায়।

ইন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে বলেন, 'নাচাচ্ছি মানে?'

স্বামীর কথা বুঝিবা সুধাময়ীর কানে যায় না। রুষ্ট মুখে বলতে থাকেন, 'কোথায় মেয়ের বিয়ে দেবে, সে আর দশজনের মতো ঘর-সংসার করবে, তা নয়। সিনেমা করার জন্যে সমানে উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। এমন সৃষ্টিছাড়া বাপ আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি।' একটু থেমে শুরু করেন, 'মেয়ে যখন পুনেতে যাবার জন্যে খেপে উঠল আমি বার বার বারণ করলাম কিন্তু কে কার কথা শোনে! লাফাতে লাফাতে গিয়ে তাকে ভর্তি করে এলে। এখন ক্যামেরা ঘাড়ে করে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঘর-সংসারে এ মেয়ের আর মন বসবে!'

এটা ঠিক, ইন্দ্রনাথ পাশে না দাঁড়ালে পুনেতে কোর্স করতে যাওয়া রণিতার পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। সুধাময়ীর প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি ওকে পছন্দমতো কেরিয়ার গড়ে তুলতে দিয়েছেন। আসলে মেয়েদের সম্বন্ধে সুধাময়ীর ধ্যানধারণা অনেকটাই সেকেলে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, এটা তিনি অবশ্যই চান। তবে তারা সব কিছু ফেলে শুধু কাজকর্মে মেতে উঠুক, এ ব্যাপারে তাঁর মন একেবারেই সায় দেয় না। একান্তই যদি কিছু করতে হয় স্কুল-কলেজে পড়াক, বড় জোর কোনো অফিসে ভদ্র পরিবেশে দশটা-পাঁচটা চাকরি করুক। কিন্তু তাদের লক্ষ বা অভীষ্ট হবে ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান। মেয়েরা পুলিশ অফিসার হবে, ফিল্ম-মেকার হবে, প্লেন চালাবে, কাজের অছিলায় যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবে, যখন ইচ্ছা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, যখন ইচ্ছা ফিরে আসবে—এসব তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণায় পুরুষ পুরুষই, মেয়ে মেয়েই। কখনই তারা সমান হতে পারে না। শারীরিক মানসিক, সমস্ত দিক থেকেই তাদের অনেক তফাত। সারা পৃথিবী জুড়ে মেয়েরা ইদানীং বহু ব্যাপারেই যে পুরুষদের টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও তিনি দেখবেন না। লোহার ফ্রেমে আঁটা নিজের ভাবনা-চিন্তা ধ্যানধারণার বাইরে একটা পা-ও ফেলতে তিনি রাজি নন।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আরে বাবা, বসবে বসবে। তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন?'

সুধাময়ী বলেন, 'হচ্ছি শখ করে। ছোটদার সম্বন্ধটা তো ভেঙে দিলে তোমার মেয়ে। তুমি যে বলেছিলে দু'টি ভাল ছেলে আছে—'

শশব্যস্তে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আছেই তো।'

'তুমি তাদের বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বল।'

'বলব, নিশ্চয়ই বলব।'

'সত্যি বলবে। তোমাকে তো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখছি।' সুধাময়ীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে, 'চিরটা কাল বনের মোষ তাড়িয়ে গেলে। নিজের ছেলেমেয়ে, ঘর-সংসারের দিকে যদি নজর থাকে!'

সুধাময়ীর এই কথাগুলো শতকরা একশ' ভাগ সত্যি। নিজের পড়াশোনা, লেখালিখি, ইউনিভার্সিটি, ছাত্রছাত্রী—এ সব নিয়েই এত কাল মগ্ন থেকেছেন ইন্দ্রনাথ। ছেলেমেয়েরা যে ভাল রেজাল্ট করেছে, বড় মেয়ে এবং ছেলের বিয়ে সম্ভব হয়েছে, তা শুধু সুধাময়ীর জন্য। মৃদু, আপাতকোমল এই মানুষটির মধ্যে প্রবল এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তিনি যা ভাবেন, শেষ পর্যন্ত করে ছাড়েন।

ইন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বিব্রত মুখে বলেন, 'এবার দেখে নিও।'

সুধাময়ী বলেন, 'দেখব। তোমাকে তিন মাস সময় দিলাম, তার মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হলে আমি দাদাদের কাছে চলে যাব। এ বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'

ভয়ে ভয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তিন মাসের ভেতরেই ছোট খুকির বিয়ে দেব।'

খাওয়াদাওয়ার পর সুধাময়ী কিছুক্ষণের জন্য খাবার ঘরে থেকে গেলেন। পরদিন কী বাজার হবে, কোন কোন পদ রান্না হবে, সব বুঝিয়ে দেবেন দশরথকে।

ওদিকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সত্যি সত্যি তিন মাসের মধ্যে আমার বিয়ে দেবে বাবা?' তাকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'দিতে তো হবেই। তোমার মায়ের আদেশ। তাছাড়া আমাদের কাছে ছোট থাকলেও অন্যের চোখে আটাশ বছর বয়েসটা খুব কম না ছোট খুকি।'

রণিতা বুঝতে পারে বাবা মজা করছেন না। ঢোক গিলে সে বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'নয়নতারার ওপর ডকু-ফিচারটা করব বলে কথা দিয়েছি। এর ভেতর বিয়ে—' বলতে বলতে চুপ করে যায় রণিতা।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই করবি ছবিটা। তবে বিয়েটাও করতে হবে।'

ওরা দোতলায় উঠে এসেছিল।

রণিতা একটু চাপা গলায় ডাকে, 'বাবা—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে কিছুটা অবাক হয়ে যান ইন্দ্রনাথ। বলেন. 'কী রে?'

মুখ নামিয়ে রণিতা বলে, 'আমার বিয়ের জন্যে তোমাকে কারো সঙ্গে কথা বলতে হবে না।'

'মানে?'

একটু চুপ করে থাকে রণিতা। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলে, 'অমিতেশের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।'

বুঝতে খানিকটা সময় লাগে ইন্দ্রনাথের। একসময় গলার স্বরটাকে উঁচুতে তুলে বলে ওঠেন, 'আই সি, আই সি। কী করে ছেলেটি?'

'জার্নালিস্ট।'

'আমাদের কাস্টের তো?'

'না। তুমি জাতপাত মানো?'

'নেভার। কিন্তু তোর মা মানেন, তাঁর অমতে কিছু করা প্রায় অসম্ভব।'

রণিতা বলে, 'তুমি সোসাল জাস্টিসের কথা বল। মানুষে মানুষে ইকোয়ালিটির কথা বল, আর মায়ের নাম করে ইনজাস্টিসকে সাপোর্ট করতে চাইছ!' তার গলায় ক্ষোভ ফুটে ওঠে।

মেয়ের কাঁধটা আলতো করে ছুঁয়ে ইন্দ্রনাথ একটু হাসেন, 'এত অস্থির হয়ো না। তোমার মাকে আঘাত দেওয়া তো কোনো কাজের কথা নয়। তিনি যাতে মনে কোনো দ্বিধা বা তিক্ততা না রেখে রাজি হন সেটা দেখতে হবে। তার জন্যে সময় দরকার। এবার ছেলেটি সম্পর্কে ডিটেলে বল।'

বাবাকে যে ভুল বুঝেছিল, অকারণে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, সে জন্য মনে মনে লজ্জা পায় রণিতা। নিচু গলায় জানায় অমিতেশেরা বাঙালি ক্রিশ্চান। তারা এক ভাই, এক বোন, বাবা নেই। সে বড়, ছোট বোন ইংরেজি নিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এম. এ করছে, খুব ভাল স্টুডেন্ট। মা একটা হায়ার সেকেন্ডারি মিশনারি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। ডোভার লেনে ওদের নিজেদের বাড়ি।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক আছে, জানা রইল। কিভাবে এগুবো, সেটা ভাবতে হবে। তোর মায়ের তো বটেই, আত্মীয়স্বজনদের সাপোর্টও পাওয়া দরকার।'

রণিতা চমকে ওঠে, 'সে কী! তুমি—'

হাত তুলে মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আরে বাবা, এক্ষুণি আমি ঢাল পিটিয়ে কাউকে জানাতে যাচ্ছি নাকি? ধীরে ধীরে. সইয়ে সইয়ে, সবার পালস বুঝে কথাটা তুলব। তাড়াহুড়ো করতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।'

রণিতা বুঝতে পারে, অধৈর্য হলে চলবে না। তাদের বংশে এখন পর্যন্ত জাত গোত্র মিলিয়ে এবং যোটক দেখে বিয়ে হয়েছে। পারিবারিক সেই প্রথাকে ভাঙা খুব সহজ নয়। এখানে শুধু জাতের ব্যাপার নয়, অমিতেশদের ধর্মও আলাদা। ফলে সমস্যাটা আরো জটিল এবং স্পর্শকাতর। বাবার ওপর তার চিরকালই অগাধ বিশ্বাস, তিনি সবাইকে দিয়ে এ বিয়ে যে মানিয়ে নিতে পারবেন, সে সম্বন্ধে তার সংশয় নেই। তবু—

ইন্দ্রনাথ এবার বলেন, 'আসল খবরটা কিন্তু এখনও পাইনি।'

রণিতা অবাক হয়ে বলে, 'আসল বলতে!'

'ছেলেটা কিরকম? অনেস্ট আর সিনসিয়ার তো?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'ওর সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?'

'দশ বছরের। আমি যেবার প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলাম ও তখন থার্ড ইয়ারে। সেই থেকে—'

'ঠিক আছে।'

একটু চুপ।

তারপর আদুরে গলায় রণিতা বলে, 'বাবা, কাল কি পরশু বিকেলে তোমার কি একটু সময় হবে?'

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন?'

'অমিতকে তোমার কাছে নিয়ে আসতাম।'

'এখন না। কবে আনবি পরে বলে দেব।'

রণিতা আর কিছু বলে না। সে বুঝতে পারে, তাদের বিয়ের ব্যাপারে মনের দিক থেকে পুরোপুরি প্রস্তুত না হয়ে ইন্দ্রনাথ অমিতেশের সঙ্গে আলাপ করবেন না।

চার

পরদিন সকালে চা খাওয়ার পর নিজের ঘরে বসে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে টুকে আনা আগের দিনের নোটগুলো দেখছিল রণিতা, এই সময় হল-ঘরে

ফোন বেজে উঠল। বেরিয়ে এসে সেটা তুলে কানে ঠেকাতেই ওধার থেকে অমিতেশের গলা ভেসে এল, 'কে, রণি?'

'হ্যাঁ।' দ্রুত চারপাশ একবার দেখে নিল রণিতা । হল-ঘরটা এখন একেবারে ফাঁকা। ইন্দ্রনাথ তাঁদের বেড-রুমে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। সুধাময়ী আশেপাশে কোথাও নেই, রোজ সকালের দিকে দশটা পর্যন্ত তাঁর পুজোর ঘরে কেটে যায়।

অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'আজ সকালে ফোন করতে বলেছিলে কেন?'

রণিতা বলে, 'মৃণাল তোমাকে কিছু বলেনি?'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। কাল রাতে সাড়ে এগারোটায় ফরাক্কা থেকে ফিরেছি। মৃণাল তার আগেই চলে গেছে। তবে তোমার মেসেজটা রেখে গিয়েছিল। বল কী করতে হবে।'

নয়নতারাকে নিয়ে ডকু-ফিচারের পরিকল্পনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে রণিতা বলে, 'তোমাদের অফিস লাইব্রেরিতে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।'

রীতিমত উত্তেজিতই হয়ে ওঠে অমিতেশ। বলে, 'এ তো দারুণ প্রোজেক্ট। লাইব্রেরির ব্যাপারটা হয়ে যাবে। নো প্রবলেম। অফিসে চলে এসো।'

'কখন আসব বল—'

'এডিটর এগারোটায় অফিসে আসেন, তুমি তখনই আসতে পার। ওঁকে একবার শুধু বলে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে। তোমাকে আরেকটা ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।'

'কী সেটা?'

'নানা সোর্স থেকে নয়নতারা সম্পর্কে ডাটা জোগাড় করতে পারব। কিন্তু দ্যাটস নট সাফিসিয়েন্ট। আসল মানুষটাকে না পেলে ডকু-ফিচারটা ড্র্যাব, লাইফলেস হয়ে যাবে, কোনো চার্ম থাকবে না। ওঁকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে কিন্তু।'

'ওরে বাবা!' গলার স্বর শুনে মনে হয় আঁতকে উঠেছে অমিতেশ, 'রিপোর্টারকে তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর বানাতে চাইছ! ক্রিমিনাল হয়, পলিটিক্যাল লিডার হয়, তাদের খোঁজ তবু করতে পারি। এ সব আমার জুরিসডিকশানে পড়ে। তুমি ছাড়া অন্য কোনো মহিলার পেছনে কখনও ঘুরিনি। কিন্তু এ একেবারে চলচ্চিত্রের হিরোইন, এক সময়ের গ্ল্যামার কুইন। স্রেফ মরে যাব রণি।'

রণিতা ধমকে ওঠে, 'ইয়ার্কি করো না। দু উইক টাইম দিলাম, তার ভেতর নয়নতারাকে চাই। মনে রেখো, এখন থেকে তিন মাসের মাথায় শুটিং শুরু করব।'

'ঠিক হ্যায় শ্রীমতীজি, তাই হবে। যিনি আট বছর আগে নিখোঁজ হয়েছেন তাঁর পাত্তা লাগাতে পারব কিনা জানি না, তবে একটা এক্সপিরিয়েন্স তো হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর গলার স্বর অনেকটা নিচে নামিয়ে গোপন ষড়যন্ত্রকারীর মতো রণিতা বলে, 'তোমার আর আমার ব্যাপারে একটা দারুণ ডেভলপমেন্ট হয়েছে।'

উৎসুক সুরে অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'কিরকম?'

'কাল বাবাকে তোমার কথা বলেছি।'

'ইজ ইট?'

'ইয়া—'

'কী বললেন তিনি?'

কণ্ঠস্বরে বোঝা যায়, অমিতেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা চারিয়ে গেছে। রণিতা বলে, 'তোমার অফিসে গিয়ে বলব।'

অমিতেশ তবু জানতে চায়, 'ফেভারেবল তো?'

'এখন সাড়ে আটটা বাজে। ঠিক এগারোটায় তোমাদের অফিসে পৌঁছচ্ছি। আড়াই ঘণ্টা সাসপেন্সে থাকো।'

'ঠিক আছে। দশ বছর যখন নাকে বঁড়শি আটকে ঝুলিয়ে রেখেছ তখন আরো আড়াই ঘণ্টাও ঝুলে থাকতে পারব।'

সময়ের ব্যাপারে ভীষণ সচেতন রণিতা। কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় 'দিনকাল' অফিসে পৌঁছে যায়।

বাড়িটা পাঁচতলা এবং আগাগোড়া এয়ার-কণ্ডিশনড। একতলায় রিসেপশন, প্রেস, সাকুলেশন, ইত্যাদি নানা ডিপার্টমেন্ট। দোতলার বেশির ভাগটা জুড়ে বিজ্ঞাপন বিভাগ। 'দিনকাল'-এর তিনটে ম্যাগাজিন আছে— দুটো উইকলি, একটা ফোর্টনাইটলি। সেগুলোর দপ্তরও দোতলাতেই। তেতলার গোটাটা নিয়ে নিউজ এবং এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট। এখানে বিরাট একটা হল ঘিরে এডিটর, নিউজ এডিটর, চিফ রিপোর্টার, ফিচার এডিটর, ফিল্ম এডিটরদের জন্য ছোট বড় মাঝারি, নানা সাইজের চেম্বার। হল-ঘরের একটা দিক সাব-এডিটর এবং অন্য দিকটা রিপোর্টারদের জন্য সংরক্ষিত। প্রত্যেকের টেবলেই রয়েছে ছোট ছোট পার্সোনাল কম্পিউটার। দুই এলাকার সীমানায় পি টি আই আর ইউ এন আই-এর টেলিপ্রিন্টার। চারতলায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস এবং লাইব্রেরি। পাঁচতলায় ক্যান্টিন, ফোটোগ্রাফি আর আর্ট ডিপার্টমেন্ট।

বছর চারেক হল 'দিনকাল'-এ চাকরি পেয়েছে অমিতেশ। তারপর অসংখ্য

বার এখানে এসেছে রণিতা। এই বিশাল, পাঁচতলা বাড়িটার গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে টপ ফ্লোর পর্যন্ত কোথায় কী আছে, সব তার মুখস্থ।

'দিনকাল' অফিসে ঢোকার ব্যাপারে প্রচণ্ড কড়াকড়ি। কেননা এই কাগজে মাঝে মাঝে এমন সব রিপোর্ট বেরোয় যাতে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে মস্তানরা এসে হামলা করে থাকে। তাই সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। রিসেপশানের তুখোড় তরুণীটি যার নাম বিপাশা সেন, অবাঞ্ছিত ভিজিটরদের একতলাতেই আটকে দেয়। কিন্তু রণিতার ব্যাপারে বাধা নেই, তার কাছে এ অফিসের দরজা সব সময় খোলা।

বিপাশা রণিতাকে ভালই চেনে। মিষ্টি হেসে বলে, 'অমিতেশ দাস মিনিট দশেক হল এসেছেন। যান, চলে যান—' এ অফিসে নিয়মিত ভিজিটররা কে কার কাছে আসে, সব তার জানা।

রণিতাও হাসে। তারপর মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে 'থ্যাঙ্ক য়ু' বলে রিসেপশান কাউন্টারের পাশ দিয়ে লিফটের দিকে চলে যায়।

তেতলায় আসতেই দেখা যায় নিউজ ডিপার্টমেন্টের প্রকাণ্ড হল-টা প্রায় ফাঁকা। সাব-এডিটরদের কেউ কেউ অবশ্য এসেছে। রিপোর্টিং সেকশানে অমিতেশ ছাড়া কেউ নেই, পার্সোনাল কম্পিউটারে বোতাম টিপে টিপে কী যেন কম্পোজ করছিল।

নিঝুম, প্রায় নির্জন হল-টায় সদা তৎপর টেলিপ্রিন্টার মেশিন দুটো শুধু খটখট আওয়াজ তুলে হিল্লি-দিল্লি-মক্কা-মদিনা-লন্ডন-প্যারিসের খবর দিয়ে যাচ্ছে। রণিতা জানে, খবরের কাগজের অফিস, বিশেষ করে নিউজ ডিপার্টমেন্ট জমে ওঠে বিকেলের পর থেকে। মারাত্মক কোনো ঘটনা না ঘটলে সকালের দিকটায় এখানে জড়িয়ে থাকে ঢিলেঢালা, আলস্যের ভাব।

রণিতাকে দেখে কম্পিউটারে কম্পোজ বন্ধ করে অমিতেশ বলে, 'এস এস। একেবারে ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি! এগারোটা মানে এগারোটাই।'

একটু হেসে মুখোমুখি এসে বসে রণিতা।

অমিতেশের বয়স তিরিশ একত্রিশ। বেশ ভাল হাইট তার। লম্বাটে মুখে সযত্নে ছাঁটা দাড়ি, চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, গায়ের রং তামাটে, চওড়া কপাল, বড় বড় চোখের দৃষ্টি শান্ত কিন্তু দূরভেদী। পরনে এই মুহূর্তে দামি কটনের ট্রাউজার আর টি-শার্ট। বাঁ হাতে চৌকো জাপানি ঘড়ি।

অমিতেশ বলে, 'এডিটরের পারমিশান পেয়ে গেছি।' তারপর ফোন তুলে

অপারেটরকে সম্পাদকের ঘরে লাইনটা দিতে বলে। যোগাযোগ হলে সে জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, রণিতা এসে গেছে। ওকে কি নিয়ে যাব?'

ওধার থেকে খুব সম্ভব সম্পাদকের সম্মতি পাওয়া যায়। ফোন নামিয়ে রেখে অমিতেশ বলে, 'চল,.এডিটর তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

রণিতা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলে, 'কী ব্যাপার? এর আগেও কত বার তোমাদের লাইব্রেরিতে পেপার টেপার দেখেছি, উনি তো কখনও দেখা করার কথা বলেননি।'

'এবার দরকার হয়েছে। এস।'

হল-ঘরের ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সম্পাদক পরাশর বসুর চেম্বার। আগাগোড়া কাঠের প্যানেল-করা চেম্বারটা চমৎকার সাজানো। দামি কাশ্মীরি কার্পেটে ওয়াল টু ওয়াল গোটা ফ্লোরটা মোড়া। কাচ আর কাঠের সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে অজস্র রেফারেন্সের বই। মাঝখানে বিশাল অর্ধবৃত্তাকার টেবলের ওধারে সম্পাদকের পুরু গদিওলা রিভলভিং চেয়ার। টেবলের এধারে আরো ডজন দেড়েক চেয়ার, সেগুলো দর্শনার্থীদের জন্য। টেবলের ওপর দশ বারোটা নানা রঙের টেলিফোন, কিছু ফাইল, পেন-হোল্ডারে গোটাকয়েক পেন যার সবগুলোই বিদেশি। আর আছে টেবল ক্যালেন্ডার, একটা বড় গ্লোব, ছোট কম্পিউটার ইত্যাদি।

রণিতারা ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে আছেন পরাশর। বয়স ছাপ্পান্ন সাতান্ন, নিখুঁত কামানো মুখ, গায়ের রং লালচে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, ভারি গম্ভীর মুখে মোটা ফ্রেমের চশমা। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় এই মানুষটির মধ্যে রয়েছে প্রবল, অনমনীয় এক ব্যক্তিত্ব।

পরাশর বলেন, 'বসুন মিস মিত্র, তুমিও বসো অমিতেশ।'

রণিতারা টেবলের এধারে তাঁর মুখোমুখি বসে পড়ে।

পরাশর রণিতার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আগে কফি খান, তারপর কাজের কথা শুরু করা যাবে।'

'দিনকাল' অফিসে মাঝে মাঝে এলেও পরাশরের সঙ্গে আগে রণিতার আলাপ হয়নি। আলাপের কারণও ছিল না। লাইব্রেরিতে কাগজপত্র দেখার পারমিশান তাকে বরাবরই এনে দিয়েছে অমিতেশ। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তবে পরাশরকে অনেক বার দূর থেকে দেখেছে সে! অল্প হেসে বলে, 'ঠিক আছে।'

বেয়ারাকে দিয়ে কফি আনিয়ে হালকা চুমুক দিতে দিতে পরাশর বলেন,

'অমিতেশের কাছে শুনলাম নয়নতারাকে নিয়ে আপনি একটা ডকু-ফিচাব করতে চাইছেন। এ ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্টেড।'

টেবল থেকে কফির কাপ খানিকটা তুলেছিল রণিতা, আস্তে আস্তে সেটা নামিয়ে রাখে। পরাশরকে লক্ষ করতে করতে তার আগ্রহের কারণটা বুঝতে চেষ্টা করে।

পরাশর জিজ্ঞেস করেন, 'প্রোজেক্টটা কী অবস্থায় আছে?'

রণিতা বলে, 'কী অবস্থায় বলতে?'

'অমিতেশ বলছিল দূরদর্শন ওটা করার জন্যে আপনাকে কমিশন করতে চায়।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে ওদের এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে?'

এত কথা কেন পরাশর জানতে চাইছেন, বুঝতে পারছিল না রণিতা। সে বলে, 'এখনও হয়নি। দিন পনেরোর ভেতর ওরা আমাকে দিল্লি যেতে বলেছে। আশা করি তখন হয়ে যাবে।'

পরাশর বলেন, 'যদি কোনো কারণে না হয় জানাবেন। আমরা প্রোজেক্টটা স্পনসর করব।'

খুব অবাক হয়ে যায় রণিতা। বলে, 'আপনারা কি অডিওভিসুয়াল মিডিয়ায় আসতে চাইছেন?'

'প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে ওর তো কোনো বিরোধ নেই।' হেসে হেসে পরাশর বলেন, 'অডিওভিসুয়াল মিডিয়া ভীষণ পাওয়ারফুল। আমরা ঠিক করেছি ঐ মিডিয়াতেও কিছু কাজ করব। নয়নতারার ওপর ডকু-ফিচার দিয়ে শুরু করতে পারলে রাতারাতি নেশানওয়াইড পাবলিসিটি পেয়ে যাব। আ ফ্যান্টাসটিক বিগিনিং।'

রণিতা বলে, 'আপনাদের স্পনসরশিপে করতে পারলে ভালই হত কিন্তু দূরদর্শন প্রোজেক্টটা ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'একান্তই যদি না ছাড়ে, আমার অন্য একটা প্রোপোজাল আছে।'

'বলুন।'

'নয়নতারা সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক লেখা আমাদের কাগজে লিখুন। কিভাবে তিনি স্টেজ এবং ফিল্মে এলেন, কী কী ছবি করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, সব ডিটেলে চাই। যে আট বছর তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে আছেন, তাঁকে খুঁজে বার করে সেই পিরিয়ডটার ওপর বিশেষভাবে জোর দেবেন। সেই সঙ্গে চাই এখনকার বিভিন্ন মুডের প্রচুর ছবি। প্রতি সপ্তাহে কাগজের একটা ফুল পেজ আপনাকে দেব।

অ্যান্ড য়ু নো আওয়ার পেমেন্ট ইজ নট ব্যাড। উই উড পে হ্যান্ডসামলি।' বলতে বলতে একটু থামেন পরাশর। টেবলের ওপর অনেকটা ঝুঁকে ফের শুরু করেন, 'সব মেটিরিয়াল তো আমাদের লাইব্রেরিতে পাবেন না। নানা জায়গায় ছোটাছুটি, বহু লোকের সঙ্গে মিট করা, স্টেশনারি— এ সবের জন্যে প্রচুর খরচ আছে হবে। আপাতত হাজার পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

নয়নতারা সম্পর্কে মানুষের অফুরন্ত কৌতূহল। রণিতা বুঝতে পারছিল, তাঁর একটা ক্যানডিড বায়োগ্রাফি অর্থাৎ খোলামেলা অকপট জীবনী, বিশেষ করে অজানা রহস্যময় গত আটটি বছরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যদি নিয়মিত বেরুতে থাকে, 'দিনকাল'-এর সার্কুলেশন দেড় দু'গুণ বেড়ে যাবে। পরাশরের আগ্রহ বা ইন্টারেস্টটা সেখানেই। সে বলে, 'এখন টাকা লাগবে না। কাজটা তো শুরু করি। পরে দরকার হলে বলব।'

একটু চিন্তা করে পরাশর বলেন. 'ঠিক আছে। তবে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?'

'লেখাটা কিন্তু আমরাই ছাপব। আমার অনুরোধ এ নিয়ে অন্য কোনো কাগজের সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু—'

'আবার কী?'

দ্বিধান্বিতভাবে রণিতা এবার বলে, 'কাগজে লেখার অভ্যাস তো আমার নেই। স্ক্রিপ্ট ছাড়া কিছুই লিখিনি। কেউ হেল্প না করলে আমি কি পারব?'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেন পরাশর। অমিতেশের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মিস মিত্রকে তুমি সাহায্য করবে। ইটস আ সিরিয়াস ওয়র্ক। যখনই দরকার হবে অফিস থেকে এর জন্যে ছুটি নেবে।'

আস্তে মাথা নাড়ে অমিতেশ।

পরাশর এবার রণিতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ছবি তোলার জন্যে তো লোক চাই। যখনই বলবেন, আমাদের একজন স্টাফ ফোটোগ্রাফার সব সময়ের জন্যে আপনাকে দিয়ে দেব।'

রণিতা বলে, 'লাগবে না, ছবি আমিই তুলে নিতে পারব।'

একটু চুপ।

তারপর পরাশর বলেন, 'কিভাবে কাজ শুরু করবেন, কিছু ঠিক করেছেন?'

পরাশরকে তার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয় রণিতা।

পরাশর বলেন, 'ফাইন। আমার একটু সাজেশান আছে।'

'বলুন।'

'এর সঙ্গে আমাদের কাগজে বক্স নাম্বারে একটা নোটিশ দিয়ে দিন। নয়নতারাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে, ফিল্ম আর স্টেজ ওয়ার্ল্ডের ভেতরে এবং বাইরে এমন বহু মানুষ এখনও বেঁচে আছে। লিখবেন তাদের কাছে যদি কোনো অজানা তথ্য বা ফোটো থাকে যেন পাঠিয়ে দেয়। মনে হয়, এতে ভাল কাজ হবে। কুড়ি দিন পর পর দু'মাস ধরে নোটিশটা বেরুবে। প্রথম বার মিস করলেও সেকেন্ড বা থার্ড টাইমে লোকের নজরে পড়বেই।'

রণিতা বলে, 'গুড আইডিয়া। কিন্তু নোটিশটা কিভাবে দেব?'

পরাশব বলেন, 'ও ব্যাপারে আপনাকে ভাবতে হবে না।' অমিতেশকে বলেন, 'তুমি একটা ড্রাফট করে অ্যাড ম্যানেজারের হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে।'

অমিতেশ বলে, 'আচ্ছা স্যার।'

পরাশর বলেন, 'তা হলে মিস মিত্র, আপনি লাইব্রেরিতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করুন। গুড লাক।'

রণিতা আর অমিতেশ উঠে দাঁড়ায়। রণিতা বলে, 'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার।'

সম্পাদকের কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা চারতলায় লাইব্রেরিতে চলে এল রণিতারা।

প্রায় সাত আট হাজার স্কোয়ার ফুট জুড়ে উঁচু উঁচু কাচ আর কাঠের বুক-কেসের ভেতর অজস্র বই এবং ম্যাগাজিন। আর আছে বাংলা, ইংরেজি আর হিন্দি ভাষার অজস্র খবরের কাগজ, সাল তারিখ অনুযায়ী সেগুলো সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের পুরনো কাগজ মাইক্রো ফিল্ম করে রাখার ব্যবস্থাও আছে এখানে।

একধারে কোমর-সমান উঁচু ঘেরা জায়গায় লাইব্রেরিয়ান জ্যোতির্ময় বসাকের চেম্বার। এখন তিনি সেখানেই বসে আছেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, পাতলা মেদহীন চেহারা, ধারাল নাক মুখ, সরু থুতনি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, ডান দিকে সিঁথি। চোখে হালকা ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। পরনে ট্রাউজার আর শার্ট। তাঁর সামনের মস্ত টেবলটায় বই আর ম্যাগাজিনের স্তূপ। দেখেই বোঝা যায়, ওগুলো নতুন এসেছে, এখনও নাম্বার লাগিয়ে বুক-কেসে তোলা হয়নি। এছাড়া আছে টেলিফোন, কিছু ফাইল, টেবল ক্যালেন্ডার, ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময় বসাকের তিন জন অ্যাসিস্টান্ট। কাল মর্নিং আর ইভনিং এডিশানের যে সব কাগজ এসেছে দু'জন সেগুলো মোটা নাইলনের সুতো দিয়ে গেঁথে ফাইল করে রাখছে। অন্য অ্যাসিস্টান্টটি বইয়ের ধুলো টুলো ঝেড়ে সাফ করছে।

জ্যোতির্ময় অমিতেশদের দেখে ডাকেন, 'আরে এস এস—'

অমিতেশরা জ্যোতির্ময়ের সামনে গিয়ে বসে।

আগেই রণিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের আলাপ হয়েছিল। হাসিমুখে চোখের ভুরু সামান্য তুলে বলেন, 'কী ব্যাপার রণিতা, এবার তোমার ডকুমেন্টারির কী থিম?' রণিতাকে তিনি তুমি করেই বলেন।

রণিতা মজা করে হাসে, 'ও বাবা, বসতে না বসতেই কাজের কথা!'

'কাজ ছাড়া কি তোমার দর্শন পাওয়া যায়?' জ্যোতির্ময়ও হাসতে থাকেন।

কথাটা ঠিক। একটু লজ্জা পেয়ে রণিতা বলে, 'অকারণে এসে আপনার সময় নষ্ট করার মানে হয় না। তাই—'

জ্যোতির্ময়ের দুই চোখ নেচে ওঠে। বলেন, 'খুব শাহেনশা মেয়ে! চমৎকার ম্যানেজ করেছ।' আজকালকার ছেলেছোকরাদের ইডিয়মগুলো তিনি ভালই জানেন এবং জায়গামতো প্রয়োগও করে থাকেন।

রণিতা শুধু হাসে, উত্তর দেয় না।

জ্যোতির্ময় এবার বলেন, 'নো সঙ্কোচ, নো লজ্জা, বল তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।'

অমিতেশ রণিতার নতুন প্রোজেক্টটার কথা জানিয়ে দেয়।

'নয়নতারা! দ্যাট গ্রেট লেডি অফ স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রিন!' বলে ভুরু কুঁচকে, চোখ বুজে অনেকক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন জ্যোতির্ময়, সেই অবস্থাতেই একসময় বলে ওঠেন, 'যতদূর মনে পড়ছে, ওঁরা ছিলেন ইস্ট বেঙ্গলের রিফিউজি, নাইনটিন ফর্টিনাইনে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় চলে আসেন। ফিফটিতে সিনেমায় নামেন। ফার্স্ট ছবি ফ্লপ, সেকেন্ড ছবি ফ্লপ, থার্ড ছবি ফ্লপ, ফোর্থ ছবি ফ্লপ, ফিফথ অ্যাভারেজ বিজনেস। ফিফটি টু'তে ওঁর সিক্সথ ছবি 'জন্মভূমি' রিলিজ করল। সুপার ডুপার হিট। তারপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। 'জন্মভূমি' থেকেই একটা লিজেন্ডের জন্ম হল, শুরু হল ফ্যাবুলাস এন্ডলেস সাকসেস স্টোরি।' বলতে বলতে চোখ খুলে ব্যস্তভাবে একজন অ্যাসিস্টান্টকে ডাকেন, 'সুরেশ, ডানদিকের ওয়ালের চার নম্বর বুক-কেসের ফিফথ তাক থেকে নয়নতারার ওপর চারটে ফাইল আছে। নিয়ে এস।'

রণিতা জানে, এই লাইব্রেরির কোন আলমারি বা বুক-কেসে কোন ফাইল, কোন পেপার কাটিং বা বই আছে, সব চোখ বুজে বলে দিতে পারেন জ্যোতির্ময়।

বছর চল্লিশ বয়স সুরেশের, মাঝারি হাইট, নিরেট চেহারা। দু'মিনিটের ভেতর চারখানা ঢাউস ফাইল এনে জ্যোতির্ময়ের টেবলে রাখে।

জ্যোতির্ময় রণিতাকে বলেন, 'এর ভেতর শুধু আমাদের কাগজেরই না, অন্য লিডিং ডেইলিরও বেশ কিছু পেপার কাটিং রয়েছে। আপাতত এগুলো দেখ। পরে ম্যাগাজিনের কাটিং আর ওঁর ফোটোও দেব। মনে হচ্ছে নয়নতারার সাত ভলিউম ফোটো অ্যালবাম আছে আমাদের লাইব্রেরিতে।'

রণিতার ধারণা ছিল, উনিশ শ পঞ্চাশে নয়নতারা যখন প্রথম সিনেমায় নামেন সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সব কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে তথ্য বার করতে হবে। এত সহজে সব পাওয়া যাবে ভাবতে পারেনি সে। জ্যোতির্ময় যেন তার জন্য সমস্ত কিছু আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছেন। মনে মনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে রণিতা।

হল-ঘরের মাঝখানে টানা লম্বা টেবলের দু'পাশে সারি সারি চেয়ার পাতা রয়েছে, ওখানে বসে পড়ার ব্যবস্থা।

ফাইলগুলো নিয়ে রণিতা আর অমিতেশ পড়ার টেবলে চলে আসে।

অমিতেশ চারদিক ভাল করে লক্ষ করে গলা নামিয়ে বলে, 'তোমার এখানকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি কিন্তু এখনও সাসপেন্সে ঝুলে আছি। পূজ্যপাদ ভাবী শ্বশুরমশাই কী বললেন, এখনও জানাও নি।'

রণিতা এই নিয়ে খানিকটা মজা করতে পারত, করল না। প্রথমত, নয়নতারা সম্পর্কিত পেপার কাটিং এবং ছবিগুলো দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে সে খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, এই লাইব্রেরি ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনার জায়গা নয়। তার জন্য আলাদা মুডও দরকার।

রণিতা বলে, 'বাবার সাপোর্ট আছে কিন্তু বিয়েটা তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে হয় না। হোল ব্রিগেড অব রিলেটিভস ক্রিশ্চানকে বিয়ে করছি জানলে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাধিয়ে দেবে। বাবা তাদের সামলাবার জন্যে সময় চেয়েছেন। ততদিন ধৈর্য ধরে ওয়েট করতে হবে, বুঝলে?'

দুই হাতের তালু উলটে দেয় অমিতেশ। তার মুখে বিষণ্ণ হাসি ফোটে। বলে, 'বুঝলাম।'

'এবার যাও। আমি ফাইলগুলো খুলি।'

'যাচ্ছি। আমারও ক'টা জরুরি কাজ আছে, সেগুলো সেরে ফেলি। তুমি কতক্ষণ এখানে থাকবে?'

'চারটে, সাড়ে চারটে পর্যন্ত।'

'তখন আসব।'

'আচ্ছা।'

অমিতেশ চলে যায়।

পাঁচ

দিন দশক কেটে গেল। এর মধ্যে দৈনিক কাগজের ফাইল আর ম্যাগাজিন ঘাটাঘাঁটি করে নয়নতারার অভিনয় জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা হয়ে গেছে রণিতার। প্রচুর নোট নিয়েছে সে।

উনিশ শ পঞ্চাশে সিনেমায় নামার পর থেকে ছিয়াশিতে নিরুদ্দেশ হবার আগে পর্যন্ত সবসুদ্ধ একশ একুশটা ছবিতে নয়নতারা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। জ্যোতির্ময় যা বলেছেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। প্রথম চারটে ছবির সবগুলোই তাঁর ফ্লপ হয়েছে। কুড়িটা ছবি মোটামুটি ব্যবসা করেছিল। বাকি সাতানব্বইটা ছবির প্রতিটি বক্স-অফিসের দিক থেকে দু' কোটি টাকা পর্যন্ত লাভ করেছে। এ সবের কারণ নয়নতারার প্রবল স্ক্রিন পার্সোনালিটি, চমৎকার অভিনয়ের ক্ষমতা, চোখ-ঝলসানো গ্ল্যামার। তাঁর হাসিটি ছিল এমনই মাদকতাময় যে দর্শকের হৃৎপিণ্ডে ঘূর্ণিঝড় বইয়ে দিত। পনেরো বছরের কিশোর থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সব পুরুষের তিনি স্বপ্নের নায়িকা। তাঁর যে কোনো ছবি রিলিজ হওয়া মানেই তখনকার দিনের বিরাট ঘটনা। কম করে বারো চোদ্দ উইক প্রতিটি শো থাকত হাউসফুল। ব্ল্যাকাররা রমরমা ব্যবসা করত, পাঁচ টাকার টিকিট বেচত পনেরো কুড়ি টাকায়। তারা চাইত অন্তত মাসে একটা করে তাঁর ছবি রিলিজ করুক।

প্রথম সত্তর আশিটা ফিল্মে নয়নতারা ছিলেন গ্ল্যামার কুইন। দেখা গেছে সেই সময়ের কোনো কোনো প্রতিবেদক তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন সেক্স বম্ব। কিন্তু সত্তরটার মতো ছবি হয়ে যাবার পর তাঁর অভিনয়ের স্টাইল আগাগোড়া পালটে যায়। বদলে যায় তাঁর ইমেজ। আর গ্ল্যামার বা সেক্স নয়। তাঁর ভেতর থেকে

বেরিয়ে আসেন এমন এক শিল্পী যিনি বহুবর্ণময় জীবনকে নানা দিক থেকে ছুঁতে চান। এই সময় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন আর অর্থহীন, অসার রোমান্টিক রোলে নামবেন না। এখন থেকে তাঁর ভূমিকাগুলি এই রকম। কখনও অধ্যাপিকা, কখনও প্রতিবাদী গৃহবধূ, কখনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, কখনও ফায়ারব্র্যান্ড রাজনৈতিক নেত্রী, কখনও বহুজনের হিতে নিবেদিত মিশনারি নান বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। নয়নতারার নতুন ইমেজ সারা দেশকে চমকে দিল।

গ্ল্যামার কুইন হিসেবে তিনি মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। এবার যা পেলেন তা হল মর্যাদা আর শ্রদ্ধা। তাঁর প্রতি আকর্ষণ কিন্তু এতটুকু কমল না, পুরনো জনপ্রিয়তা অটুট থেকে গেল।

ফিল্ম কেরিয়ারের মাঝামাঝি সময়ে মঞ্চে যোগ দেন নয়নতারা। মোট একুশটি নাটকে অভিনয় করেছেন। এর কোনোটাই প্যানপেনে, স্যাঁতসেতে, আবেগসর্বস্ব নয়। বেশির ভাগেরই বিষয় নানা সামাজিক সমস্যা, মূল্যবোধের ক্ষয় বা অস্তিত্বের সঙ্কট। নাটকগুলি, বিশেষ করে নয়নতারার অভিনয় দর্শককে অভিভূত করে ফেলল। একেকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়, আর নতুন করে দেশ যেন তাঁকে আবিষ্কার করে।

এত জনপ্রিয়তা, মানুষের এত শ্রদ্ধাই শুধু নয়, এর পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে রয়েছে অজস্র স্ক্যান্ডাল। রঙিন ট্যাবলয়েড আর ফিল্ম ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজ থেকে এ ব্যাপারে যেটুকু পাওয়া গেছে তা এইরকম। একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার কেরিয়ার তাঁর জন্যই নাকি শেষ হয়ে যায়। ভদ্রলোকের নাম রমাপতি সরখেল। সত্তরের দশকে নয়নতারাকে পাবার জন্য খেপে উঠেছিলেন, উন্মাদের মতো তিনি ওঁর পেছন পেছন সারাদিন ঘুরতেন। এই নিয়ে আবহাওয়া তখন সরগরম, আঁশটে গন্ধের মতো বাতাসে গুজব আর কুচ্ছো উড়ে বেড়াচ্ছে। খবরের কাগজে রোজ দু'জনকে নিয়ে মদের চাটের মতো রগরগে মশলাদার স্টোরি বেরুচ্ছে। এতে রমাপতির দলের সুনাম নষ্ট হতে থাকে। উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ পার্টি লিডারশিপ প্রথমে তাঁকে সাসপেন্ড করে, পরে অনেক ধরাধরির পর সাধারণ মেম্বার হয়েই রমাপতিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয। রাজনৈতিক দিক থেকে যাঁর আকাশ ছোঁয়ার কথা, তিনি কোথায় হারিয়ে গেছেন কে জানে। যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তাঁর হাল পোড়া তুবড়ির খোলের মতো। কেউ তাঁর খবর রাখে না।

নয়নতারার জন্য সেই আমলের একজন ডিরেক্টর বিষ খেয়ে মরেছেন। আরেক জন গলায় দড়ি দিয়েছিলেন, স্ত্রী ঠিক সময়ে দেখে ফেলায় আত্মহত্যাটা আর শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। দু'জন বিখ্যাত হিরো নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির নাইটদের কায়দায় পিস্তল নিয়ে ডুয়েল লড়েছিলেন, খুনখারাপি অবশ্য হয়নি।

হবে একজনের ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত তুললে এক টাকা সাইজের একটা শুকনো কালো দাগ চোখে পড়বে, গুলিটা তাঁর পায়ের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। নয়নতারাকে নিয়ে এরকম আরো কত যে ঘটনা তার হিসেব নেই।

নয়নতারা বিবাহিত। কিন্তু যাঁকে ঘিরে এত স্ক্যান্ডাল তাঁর দাম্পত্য জীবন কখনও সুখের হয় না। খবরের কাগজে তাঁর স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এটুকুই শুধু জানা গেছে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি স্বামীর সঙ্গে নয়নতারার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, গলফ ক্লাবের কাছাকাছি একটা বাড়িতে তিনি একলা থাকতে শুরু করেন। তবে কোর্ট থেকে বিবাহ বিচ্ছেদটা হয়েছিল কিনা তার হদিস মেলেনি। এই বাড়ি থেকেই উনিশ শ ছিয়াশিতে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

নয়নতারা আলৌকিক কোনো দেবী নন, ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য স্তুতি-কুৎসার মিশ্রণে রক্তমাংসের উষ্ণ, পরিপূর্ণ এক মানুষী। খবরের কাগজের হলদে হয়ে-আসা শুষ্ক পুরনো পাতা আর তাঁর অভিনীত ফিল্মগুলি থেকে কতটুকুই বা তাঁকে পাওয়া যাবে! ডকু-ফিচারটায় জীবনের উত্তাপ, উত্তেজনা আর গাঢ় আবেগ চারিয়ে দিতে হলে নয়নতারাকে চাইই চাই।

লাইব্রেরিতে কাগজপত্রের স্তূপের ভেতর মুখ ডুবিয়ে রণিতা যেমন নোট নিয়েছে সেই সময় ফিল্ম স্টুডিওগুলোতে গিয়ে নয়নতারার খোঁজ করেছে অমিতেশ কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান দিতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত ওরা ঠিক করেছে, প্রথমে যাবে পুলিশের মিসিং পার্সনস ডিপার্টমেন্টে। ওদের কাছে নিখোঁজ মানুষজনের অনেক খবর থাকে। তারপর দেখা করবে মৃণালের মামা, 'দি মর্নিং স্টার' পত্রিকার প্রাক্তন সিনেমা এডিটর মণিময় চ্যাটার্জির সঙ্গে। মৃন্ময় তাঁর সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। যে কোনো দিন সন্ধের দিকে রণিতারা মণিময়ের বাড়ি যেতে পারে।

আজ দুপুরে লালবাজারে মিসিং পার্সনস ডিপার্টমেন্টে গেল রণিতা আর অমিতেশ। আগেই ওরা ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল।

অফিসার-ইন-চার্জ রণজয় সেন রণিতাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বয়স চল্লিশের নিচে, বেতের মতো ছিপছিপে চেহারা। পুলিশ বলতে যে গম্ভীর ভয়ঙ্কর একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে তিনি মোটেই তা নন। তাঁকে দেখলে মন ভাল হয়ে যায়।

রণজয় হাসিমুখে রণিতাদের বসিয়ে বললেন, 'বলুন মিস মিত্র, আপনাদের জন্য কী করতে পারি--'

এখানে আসার কারণটা জানিয়ে দেয় রণিতা।

রণজয় রীতিমত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, 'নয়নতারাকে নিয়ে ছবি করবেন। দারুণ ব্যাপার। জানেন আমি ওঁর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু ম্যাডাম—'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

রণজয় বলেন, 'ওঁর সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই।'

খুব অবাক হয়ে যায় রণিতা। বলে, 'এত বড় একজন আর্টিস্ট, আট বছর তিনি নিরুদ্দেশ, অথচ আপনারা তাঁর খবর রাখেন না! স্ট্রেঞ্জ।'

'দেখুন, নয়নতারার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ এসে আমাদের বলেননি, ওঁকে খুঁজে বার করে দিন।'

'তাই আপনারা কিছু করেননি! ন্যাশনাল ইন্টারেস্টেও ওঁর খোঁজ করা উচিত ছিল।'

তক্ষুণি উত্তর দেন না রণজয়। বেশ কিছুক্ষণ পর বলেন, 'যিনি নিজের থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, চেনাজানা কারো সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে চান না, তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগানোটা কি ঠিক?'

এদিকটা ভেবে দেখেনি রণিতা। সে চুপ করে থাকে। রণজয় বলেন, 'তা ছাড়া আরেকটা ব্যাপারও চিন্তা করা দরকার।'

উৎসুক চোখে তাকায় রণিতা।

রণজয় থামেন নি, 'প্রত্যেক মানুষের একটা প্রাইভেট লাইফ আছে। সোসাইটির কারো কোনো ক্ষতি না করে নিজের পছন্দমতো কেউ যদি লাইফ কাটাতে চান, কেন তাঁকে আমরা ডিসটার্ব করব? কারো ব্যক্তিগত জীবনে ইন্টারফেয়ার করাটা শুধু অনুচিতই নয়, অন্যায়ও।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল অমিতেশ। এবার সে বলে ওঠে, 'কিন্তু—'

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রণজয় বলেন, 'কিন্তু কী?'

'নয়নতারা খুব সাধারণ সিটিজেন নন, তিনি বিরাট পাবলিক ফিগার। আমাদের কালচারাল ওয়ার্ল্ডে তাঁর কনট্রিবিউশানের তুলনা নেই। দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর সম্মান তিনি নিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর জন্য গর্বিত। এমন একজন আউটস্ট্যান্ডিং পার্সোনালিটির আট বছর কোনো খোঁজ নেই, অন্য দেশ হলে কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত না।'

অমিতেশের কথাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম শ্লেষ ছিল। রণজয় কিন্তু অসন্তুষ্ট হন না, আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, পুলিশের দিক থেকে না হলেও তাঁর অনুরাগী হিসেবে আমাদের সবারই ওঁর খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।'

রণিতা সোজা কাজের কথায় চলে আসে, 'আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে শুনবেন।'

রণজয় উৎসুক চোখে রণিতার দিকে তাকান।

রণিতা বলে, 'এতদিন কেউ বলেনি, তাই আপনারাও কিছু করেননি। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, ওঁর এখনকার ঠিকানাটা জোগাড় করে দিন।'

রণজয় চুপ করে থাকেন। মনস্থির করতে হয়তো তাঁর খানিকটা সময় লাগে। তারপর বলেন, 'পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে, জানতে পারলে উনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন। যতটা সম্ভব গোপনে কাজটা করতে হবে।। ঠিক আছে, আপনারা এত বড় একটা প্রোজেক্টে হাত দিতে চলেছেন, সে জন্য এই রিস্কটুকু নেব।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'ঠিকানাটা যদি সত্যি সত্যিই পাওয়া যায়, প্লিজ অন্য কাউকে জানাবেন না। মিডিয়ার লোকেরা টের পেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের প্রোজেক্টটাই তখন ভেস্তে যেতে পারে। আমরা চাই এক্সক্লুসিভলি কাজটা করতে।'

রণজয় হাসেন, 'ঠিক আছে। ঠিকানাটা পাওয়া গেলে আপনারা ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সেন। আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে ঠিকানাটার জন্য ফোন করে বিরক্ত করব।'

'বিরক্ত কী! ইটস আ প্লেজার। আপনাদের ফোন নাম্বার দিয়ে যান। হঠাৎ যদি নয়নতারার খোঁজ পেয়ে যাই আমিও যোগাযোগ করব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ছয়

পরদিন সন্ধেবেলা চেতলায় মণিময় চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে গেল রণিতা আর অমিতেশ। মৃণালেরও আসার কথা ছিল কিন্তু আসানসোলে দুই পলিটিক্যাল পার্টির ওয়ার্কারদের মধ্যে প্রচণ্ড মারদাঙ্গা বাধায় চারজন খুন হয়েছে। চিফ রিপোর্টার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাত দশটার আগে তার ফেরার সম্ভাবনা নেই।

মণিময়দের দোতলা বাড়িটা বড় না হলেও বেশ ছিমছাম। সামনে পেছনে ছোট্ট বাগানও রয়েছে। বাগান পেরিয়ে পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙে বাইরের বারান্দায় উঠে কলিং বেল টিপতেই একটি কাজের লোক একতলার ড্রইং রুমে রণিতাদের পৌঁছে দেয়।

বসার এই ঘরটা সোফা, সেন্টার টেবল, ডিভান, বুক-কেস, ওয়াল ক্লক, এয়ারলাইনসের সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার আর পেতলের চকচকে নটরাজ দিয়ে সাজানো।

ডিভানে বালিশের ওপর ভর দিয়ে আধশোয়া মতো হয়ে ছিলেন মণিময়। রণিতাদের দেখে আস্তে আস্তে উঠে বসেন। মৃণালের বন্ধু হিসেবে অমিতেশকে তিনি চেনেন। বলেন, 'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি অমিত। এই বুঝি রণিতা?'

'হ্যাঁ বড়মামা—' মৃণালের দেখাদেখি অমিতেশও মণিময়কে বড়মামা বলে।

'বসো, বসো—'

অমিতেশ আর রণিতা মণিময়কে প্রণাম করে সোফায় বসে।

যদিও সত্তরের কাছাকাছি বয়স এবং একটা বড় ধরনের স্ট্রোক হয়ে গেছে তবু মণিময়কে এখনও সুপুরুষ বলা যায়। গড় বাঙালির তুলনায় তাঁর হাইট বেশ ভাল, ছ ফিটের মতো। চুলের বেশির ভাগই কালো। চওড়া কপাল, ভারি চোয়াল, ধারালো নাক। এই বয়সেও চোখে ছানি পড়ে নি, দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং গভীর। তাঁর পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি।

কাজের সেই লোকটি একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে অমিতেশদের জন্য চা আর মিষ্টি টিষ্টি আনতে বলে রণিতার দিকে তাকান মণিময়, 'তোমার কথা টাবু আমাকে সব জানিয়েছে।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'টাবু কে?'

'ওটা মৃণালের ডাকনাম। একটি বাঙালি মেয়ে ফিল্মকে কেরিয়ার হিসেবে নিয়েছে, শুনে কী ভাল যে লাগল! তার ওপর নয়নতারার ওপর ডকু-ফিচার করতে চাইছ। ইটস রিয়ালি থ্রিলিং। এখন বল কতটা কী করেছ। মেটিরিয়াল কিছু জোগাড় হয়েছে?'

সব জানিয়ে রণিতা মণিময়ের মুখের দিকে তাকায়।

মণিময় বলেন, 'ফাইন। নয়নতারা যখন বেঁচে আছে, তাকে বাদ দিয়ে তার ওপর ভাল ছবি হতে পারে না। পুলিশের কাছে গিয়ে ভালই করেছ। ওরা চেষ্টা করলে ওর ঠিকানা হয়তো খুঁজে বার করতে পারবে। যতদিন না ঠিকানাটা পাওয়া যাচ্ছে অন্য ব্যাপারগুলো এগিয়ে রাখো।'

কাজের লোকটি রণিতা আর অমিতেশের জন্য চা সন্দেশ এবং কেক নিয়ে আসে। মণিময়ের জন্য আনে শুধু আধ কাপ পাতলা লিকার।

'খাও। খেতে খেতে কথা হোক।' বলে নিজের কাপটি তুলে নিয়ে হালকা চুমুক দেন মণিময়। তারপর বলেন, 'নয়নতারার ছবিগুলো এর মধ্যে দেখে নাও। ওর নাটকের ভিডিও ক্যাসেট বা ফিল্ম যদি কেউ করে থাকে সে সবও দেখবে। ওগুলো থেকে কোন কোন অংশের ক্লিপিং তোমার ডকু-ফিচারে লাগাবে তার নোট করে রাখবে, নইলে পরে মনে থাকবে না।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'ওঁর ছবি কোথায় পাব? আজকাল তো রেগুলারলি সিনেমা হলে ওগুলো

দেখানো হয় না। মাঝে মাঝে দু'চারটে নতুন করে রিলিজ করে। টিভিতে অবশ্য প্রায়ই দেখা যায়, তবে সব ছবি নয়।'

একটু চিন্তা করে মণিময় বলেন, 'যে সব প্রোডাকশন কোম্পানি নয়নতারার ছবি করেছে তোমাকে তাদের কাছে যেতে হবে।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'ওদের ঠিকানা কোথায় পাব?'

'আমার পুরনো ডায়েরিতে নয়নতারার কোন ছবি কবে রিলিজ করেছে, তার ডাইরেক্টর কে, কারা তার সঙ্গে অভিনয় করেছে, প্রোডিউসার কারা, তাদেব ঠিকানা, সব ডেট আর ইয়ার অনুযায়ী লেখা আছে। আমি একটা লিস্ট করে রাখব। নেক্সট উইকে এসে নিয়ে যেও।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় মণিময় এবার বলে ওঠেন, 'তবে—' রণিতা জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকায়।

মণিময় বলেন, 'ওই সব প্রোডিউসারদের অনেকেই বেঁচে নেই, কেউ কেউ ছবির রাইটসুদ্ধু প্রিন্ট বেচে কোম্পানি তুলে দিয়েছে।'

রণিতা চিন্তিতভাবে বলে, 'তা হলে—'

মণিময় বলেন, 'যাদের কাছে রাইট আছে তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা করতে হবে। যদি কিছু অসুবিধে হয় আমি ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু ওর নাটকের ভিডিও কারো কাছে আছে কিনা এক্ষুণি মনে পড়ছে না। আমার ডায়েরিতে যদি কোনো নোট থাকে, খুঁজে দেখতে হবে।'

রণিতা জানায় নয়নতারার নাটকের ব্যাপারে তার বাবা অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ তাকে সাহায্য করবেন।

মণিময় বলেন, 'তা হলে তো খুবই ভাল হয়। এর পাশাপাশি তোমাকে আরো কিছু জরুরি কাজ করতে হবে।'

রণিতা বলে, 'কী?'

'নয়নতারার সঙ্গে কাজ করেছে এমন অনেক আর্টিস্ট, ডিরেক্টর এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলবে। তাছাড়া ওর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। এঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে নয়নতারা মানুষ এবং শিল্পী হিসেবে কেমন। আর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে অভিনয়-জীবনকে ভালভাবে মেশাতে না পারলে ডকু-ফিচারটা কিন্তু জমবে না। আমি তোমাকে যে লিস্টটা দেব তাতে নয়নতারার কো-অ্যাক্টর, কো-অ্যাকট্রেস আর ডিরেক্টরদের নাম ঠিকানা থাকবে। তুমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করবে।'

'কো-আর্টিস্ট আর ডিরেক্টরদের না হয় পাওয়া গেল কিন্তু ওঁর আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা কোথায় পাব?'

'অন্য আত্মীয়রা কোথায় থাকেন জানি না, তবে নয়নতারার শ্বশুরবাড়ির

লোকজনেরা থাকতেন টালিগঞ্জে। আমার ধারণা এখনও ওঁরা ওখানেই আছেন। ওঁদের ঠিকানাটা বোধহয় দিতে পারব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মণিময় জিজ্ঞেস করেন, 'বল, আমার কাছে আর কী সাহায্য চাও।'

রণিতা হাসিমুখে, কিছুটা মজা করেই বলে, 'আপনি বলেছেন, যাঁরা নয়নতারাকে দেখেছেন বা ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁদের সঙ্গে ওঁর বিষয়ে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিই। এ কাজটা আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই।'

মণিময় হেসে ফেলেন, 'আমাকে দিয়েই? ঠিক আছে, আরম্ভ কর।'

হঠাৎ মৃণালের হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায় রণিতার। স্ট্রোক হবার পর থেকে মণিময়ের বেশি কথা বলা বারণ। সে বলে, 'আপনাকে অনেকক্ষণ বকাচ্ছি। যদি ক্লান্তি লাগে আজ থাক, পরে একদিন বসা যাবে।'

মণিময় জোরে জোরে দু'হাত নেড়ে ক্লান্তির প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বিপুল উৎসাহে বলেন, 'আমি ঠিক আছি, পারফেক্টলি অল রাইট। তোমাদের সঙ্গে নয়নতারার সম্বন্ধে কথা বলতে ভীষণ ভাল লাগছে।'

প্রশ্নগুলো মনে মনে সাজিয়েই রেখেছিল রণিতা। সে বলে, 'খবরের কাগজ আর নানা ম্যাগাজিন থেকে জানতে পেরেছি, পার্টিসানের পর নয়নতারা শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, দুই দেওর আর এক ননদের সঙ্গে ইস্ট পাকিস্তান থেকে কলকাতায় চলে আসেন। তখন অবশ্য ওঁর নাম ছিল লক্ষ্মী রায়। দেশে কিছু প্রপার্টি ছিল, একটা পয়সাও আনতে পারেন নি। কলকাতায় প্রথমে উঠেছিলেন কালিঘাটে। অবস্থা খুবই খারাপ, দু'বেলা খাওয়া জুটত না। কালিঘাটে ওঁদের প্রতিবেশী ছিলেন ফিল্মের একজন অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর। লক্ষ্মী ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টরটি বোঝাল সিনেমায় নামলে ভাল পয়সা পাওয়া যাবে। লক্ষ্মীদের রক্ষণশীল ফ্যামিলিতে গোড়ার দিকে এ নিয়ে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কিন্তু পভার্টি, হাঙ্গার এমনই ব্যাপার যার সামনে কোনো বাধা কোনো ওজরই টেকে না। লক্ষ্মী সিনেমায় নামলেন। তবে ওরকম পুরনো ধাঁচের নাম গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে অচল, ওটা পালটে রাখা হল নয়নতারা। যে ডিরেক্টর এই নামকরণটা করেছেন তিনি নাকি বলেছিলেন, একদিন দর্শকদের চোখের মণি হয়ে উঠবেন লক্ষ্মী। সেই জন্যে এই নাম দেওয়া হল। নয়নতারার প্রথম চারটে ছবি ফ্লপ। ফিফথটা অ্যাভারেজ হিট, সিক্সথটা সুপারহিট, এই ছবি থেকেই তিনি স্টার। এর বেশি ইনফরমেশন আর পাওয়া যায় নি। এবার আপনি বলুন—'

মণিময় বলেন, 'একেবারে প্রথম ছবি থেকেই নয়নতারার সঙ্গে আমার আলাপ। আজকের কথা নয়, সেই নাইনটিন ফিফটিতে একদিন স্টুডিওতে ওর শুটিং দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম। এমন বিউটি ইন্ডিয়ান স্ক্রিনে আগে আর

দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। তবে সেই সময় ওর সৌন্দর্যের মধ্যে একটা গ্রাম্য ভাব মেশানো ছিল। উচ্চারণে ছিল পূর্ব বাংলার টান। দু-তিনটে ছবির পর এই দোষটা কাটিয়ে নেয় নয়নতারা, তার চেহারায় আসে সফিস্টিকেশন।' এরপর তিনি যা বলে যান তা এইরকম। উচ্চারণ যেমনই হোক, প্রথম ছবিতেই নয়নতারা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি এ কজন দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী। তাঁর চলা, চোখমুখের অভিব্যক্তি এক কথায় অভাবনীয়। মণিময়ের তখনই মনে হয়েছিল, মেয়েটি অনেক দূর যাবে। অন্য কাগজ কিছু করার আগে তিনি 'মর্নিং স্টার'-এ নয়নতারার পুরো এক পাতা ইন্টারভিউ ছেপেছিলেন। লিখেছিলেন এই অভিনেত্রীটি ভারতীয় দর্শকদের মাতিয়ে দেবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

মণিময় একটানা কথা বলে কিছুটা হাঁফিয়ে পড়েছেন। আর তাঁকে দিয়ে বকানো ঠিক হবে না। বিব্রতভাবে রণিতা বলে, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। যাবার আগে শুধু একটা প্রশ্নই করব। যদি উত্তর দিতে ইচ্ছে না হয়, দেবেন না।'

মণিময় হাসেন, 'ঠিক আছে, কর।'

রণিতা বলে, 'কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে নয়নতারা সম্পর্কে প্রচুর স্ক্যাণ্ডালও চোখে পড়ল।'

মণিময় বলেন, 'অত বড় একজন অ্যাকট্রেস, তার ওপর প্যারাগন অফ বিউটি। ওর লাইফে স্ক্যাণ্ডাল থাকবে না? ফিল্ম অ্যাকট্রেস মিশনারি 'নান' নয়। স্ক্যাণ্ডালটা তার লাইফের 'সস'—চাটনি। ওটা না থাকলে নয়নতারার এত চার্ম কি থাকত?'

রণিতা বুঝতে পারছিল, মণিময় খুবই ঝকঝকে আধুনিক মানুষ, তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র শুচিবাই নেই। সুনাম দুর্নাম নীচতা মহত্ত্ব, সব মিলিয়ে নয়নতারার যে জীবন, পুরোপুরি সেটাই তিনি সেলুলয়েডে দেখতে চান। এদেশে নাম-করা মানুষদের নিয়ে যখন কেউ বায়োগ্রাফি লেখে কিংবা ডকুমেন্টারি ছবি করে, সেখানে শুধু ভাল ভাল দিকগুলোই ফুটিয়ে তোলা হয়। অর্থাৎ মানুষকে স্রেফ দেবতা বানাও। কোনো জননেতা যদি রক্ষিতা পোষে কিংবা অবৈধ প্রেমে ডুবে যায় বা কোনো ধর্মগুরু যদি ক্ষণিকের দুর্বলতায় নারীসঙ্গ করে বসে, তা হলে চোখ বুঝে থাকো। ফলে জীবনীগ্রন্থ আর ডকুমেন্টারিগুলোতে থাকে শুধু চড়া, উজ্জ্বল রং। অন্ধকার না থাকলে আলোর কনট্রাস্ট যে ফোটে না, সেটা এই সব জীবনীলেখক আর ডকুমেন্টারি করিয়েদের মাথায় কিছুতেই ঢোকানো যাবে না। তাদের ধারণা, খারাপ দিকগুলো দেখালে বিখ্যাত মানুষদের ইমেজ নষ্ট হবে, তাঁরা ভাববেন, তাঁদের চরিত্রহনন করা হচ্ছে।

মণিময় বলেন, 'নয়নতারার জন্যে একজন হিরো বিষ খেয়ে মরেছে, দু'জন পিস্তল নিয়ে লড়াই করেছে, এই ইনফরমেশনগুলো নিশ্চয়ই পেয়েছ!'

রণিতা আস্তে মাথা নাড়ে -- পেয়েছে।

'এক সময় এই নিয়ে সারা দেশ জুড়ে তুমুল সেনসেশন ঘটে গেছে। সে যাক, শেষের দুই হিরো এখনও বেঁচে আছে। ওদের সঙ্গে দেখা করে দেখো কিছু বার করতে পার কিনা।'

'নিশ্চয়ই দেখা করব। আজ তা হলে আসি।'

'এস।'

রণিতা আর অমিতেশ উঠে দাঁড়ায়।

সাত

আরও দু সপ্তাহ পার হল।

ক'দিন আগে সম্পাদক পরাশর বসুর পরামর্শমতো বক্স নাম্বার দিয়ে দৈনিক 'দিনকাল'-এ নয়নতারা সম্পর্কে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গেছে। আড়াইশ'র মতো চিঠি পেয়েছে রণিতারা। পত্রদাতাদের দাবি, তারা খুব কাছ থেকে নয়নতারাকে দেখার সুযোগ পেয়েছে, কেউ কেউ ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশার কথাও বলেছে। কিন্তু তাদের চিঠি থেকে নতুন বা চমকপ্রদ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, সবগুলোই উচ্ছ্বাসের রঙিন ফেনায় ভর্তি।

এর মধ্যে প্রায় রোজই লালবাজারে রণজয়কে ফোন করেছে রণিতা কিন্তু এখনও ওঁরা নয়নতারার সন্ধান পাননি। চারদিকে লোক লাগানো রয়েছে, খোঁজ পেলেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

যে প্রোডাকশন কোম্পানিগুলো নয়নতারাকে নিয়ে ছবি করেছে, গত দু'সপ্তাহে তাদের অফিসে অফিসে অমিতেশকে সঙ্গে করে রোজ দুপুরে হানা দিয়েছে রণিতা। বেশির ভাগ কোম্পানি এখনও টিকে আছে, অবশ্য আগের রমরমা আর নেই। বেশ ক'টা উঠেও গেছে। চালু কোম্পানিগুলো ডকু-ফিচারের কথা শুনে খুব খুশি, জানিয়েছে রণিতাকে সবরকম সাহায্য করবে এবং যখনই সে নয়নতারার ছবি দেখতে চাইবে তখনই দেখানো হবে। বন্ধ হওয়া কোম্পানিগুলো তাদের ছবির নেগেটিভ আর প্রিন্ট যাঁদের কাছে বেচে দিয়েছে তাঁদেরও খুঁজে বার করেছে রণিতারা। নতুন স্বত্বাধিকারীরাও ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এর ভেতর দশ-বারোটা ছবি দেখে ক্লিপিং এর জন্য ডায়েরিতে কিছু কিছু নোটও নিয়েছে ওরা।

প্রোডিউসারদের সঙ্গে নয়নতারা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনাও হয়েছে রণিতার। তাঁদের সবাই জানিয়েছে, কাজের ব্যাপারে নয়নতারা ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে, সিরিয়াস। কোনো দৃশ্যে নিজের অভিনয় পছন্দ না হলে বার বার সেটা করে যেতেন, ফলে বার বার শট নিতে হত। অভিনয়টা নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর তৃপ্তি নেই। 'ডিসিপ্লিনড' বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তা-ই। তা ছাড়া অত্যন্ত সময়ানুবর্তীও। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নয়নতারা কাজে লাগাতেন প্রায় কমপিউটারের দক্ষতায়। স্টুডিওতে দশটায় শিফট শুরু হলে ঠিক দশটাতেই চলে আসতেন। পাঁচ মিনিট আগেও না, পাঁচ মিনিট পরেও না। খুবই অমায়িক, মিশুক, সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল এক কথায় চমৎকার। সবাই তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। টাকাপয়সার ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ সচেতন, চুক্তি অনুযায়ী পাওনা মেটানো না হলে কাজ করতেন না।

নয়নতারার ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল? প্রায় সব প্রোডিউসারই জানিয়েছেন এ নিয়ে তাঁরা কখনও মাথা ঘামান নি, অতএব কোনো মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। দু-একজন বলেছেন, অনেক গোলমাল ছিল। মহিলাকে নিয়ে কত যে স্ক্যাণ্ডাল বলে বোঝাতে পারব না। সেজন্য কাজের কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি। ওঁকে দেখে টাকা লাগিয়েছি। ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা প্রফিট উঠে এসেছে। আমরা বিজনেস করি। আর্টিস্টরা কে কী করল, না করল তা নিয়ে টেনসন বাড়িয়ে আমাদের কী লাভ?

নয়নতারা যে পরিচালক এবং শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়নি, পরে তাঁদের কাছে যাবে রণিতা।

তবে 'মুনলাইট থিয়েটারে'-এর মালিক রমেন লাহার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। নয়নতারা যে সব নাটকে অভিনয় করেছেন তার বেশির ভাগেরই প্রযোজক তিনি। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন আর হল-এ আসেন না, তাঁর ছেলে সুবিমল ক'বছর ধরে ব্যবসাপত্র দেখছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ইন্দ্রনাথ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিয়েছেন। আজ সকালে রমেন লাহার নর্থ ক্যালকাটার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে রণিতারা।

হেদুয়া আর স্কটিশ চার্চ কলেজ ডান ধারে রেখে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে শ্যামবাজারের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে একটা মাঝারি রাস্তায় ঢুকে প্রথম দুটো বাড়ি ছেড়ে তিন নম্বরটাই হল 'লাহা ক্যাসল'। সামনে পেছনে ফুলের বাগান। মাঝখানে বিবাট বিরাট থামওলা গোলাপি রঙের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে তাকালে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির বনেদিআনার কথা মনে পড়ে যায়।

সে আমলের পুরনো বড়লোকেরা আর নেই, লুপ্তপ্রায় প্রজাতির মতো তারা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বিশাল প্যালেসের মতো তাদের বিরাট বিরাট বাড়িগুলো ভেঙেচুরে এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু রমেন লাহারা তার ব্যতিক্রম। নতুন রং-করা হয়েছে তাঁদের বাড়িটায়, কোথাও এতটুকু ফাটল বা চিড়ের দাগ নেই। সব নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন, অটুট। লাহা ক্যাসেলের পেছনে যে নিয়মিত প্রচুর টাকা খরচ করা হয়, দেখামাত্র তা টের পাওয়া যায়। সামনের দিকে বাগানের গা ঘেঁষে নতুন মডেলের ঝকঝকে গোটা চারেক মোটর যেমন রয়েছে তেমনি আছে দুটো ঘোড়ায় টানা ফিটন। ঘোড়া অবশ্য গাড়ির সঙ্গে জোতা নেই, সাদা ধবধবে স্বাস্থ্যবান একজোড়া প্রাণী পাশে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পা ঠুকছে। বোঝা গেল, লাহারা নতুনের সঙ্গে পুরনো চালও বজায় রাখার পক্ষপাতী।

ন'টা নাগাদ লাহা ক্যাসেলে পৌঁছে যায় রণিতা আর অমিতেশ। তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সুবিমল। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। টকটকে রং, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, বড় বড় চোখ, ভুরু দুটো যেন তুলিতে টানা। পাতলা নাকের নিচে বাহারে গোঁফ। এই সকাল বেলাতেই তিনি একেবারে ফিটফাট। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে নিয়েছেন। পরনে কারুকাজ-করা সাদা পাঞ্জাবি এবং জলচুড়িওলা কুঁচনো ধুতি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গা থেকে ভুর ভুর করে দামি সেন্টের গন্ধ উঠে আসছে। পুরনো বইয়ের পাতায় উনিশ শতকের বাবুদের যে ছবি থাকে তাদের একজন যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতজোড় করে সুবিমল বললেন, 'আসুন—'

তাঁর পেছন পেছন বিশাল অলিন্দ এবং অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় উঠে এল রণিতারা। চলতে চলতে ওদের চোখে পড়ছিল ঘরের দেওয়ালগুলো কম করে ষাট ইঞ্চি চওড়া। শ্বেতপাথরের ফ্লোর, বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি, পার্সিয়ান কার্পেট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোফা, খাট, টেবল, চেয়ার, অয়েল পেন্টিং, ব্রোঞ্জ আর পাথরের দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্য ইত্যাদি দেখতে দেখতে রণিতার মনে হচ্ছিল সত্যিকারের বড়লোকির সঙ্গে বনেদি চাল মেশালে তার ফলটা কী দাঁড়ায় তা বুঝতে হলে 'লাহা ক্যাসল'-এ একবার আসা উচিত। তাদের বাড়িতেও মেহগনির আসবাব, শ্যান্ডেলিয়ার টিয়ার আছে, কিন্তু এ বাড়ির তুলনায় সে সব কিছুই না। মনে হল, ঝাড়লণ্ঠন, রুপোর ফুলদানি, কার্পেট, স্কালপচার, আসবাব, গালিচা মিলিয়ে কম করে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকার জিনিস আছে 'লাহা ক্যাসল'-এ।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচশ' স্কোয়ার ফিটের মতো বিশাল একটা ঘরে পৌঁছে

যায় রণিতারা। ঘরটা আলমারি, ওয়ার্ডরোব, বুক-র্যাক, লেখাপড়ার জন্য চেঁয়ার টেবল, ওয়াল-ক্লক, ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। সিলিং থেকে পুরনো আমলের চার ব্লেডওলা চারটে পাখা ঝুলছে। দুই দেওয়ালে দুটো এয়ার কুলার। ঘরের ঠিক মাঝখানে কারুকাজ-করা মেহগনির খাট। খাটটা ঘিরে বেশ ক'টি সোফা আর একটা টিপয়ের ওপর গোটা চারেক রঙিন টেলিফোন। খানিকটা দূরে সুদৃশ্য স্ট্যান্ডে দামি কালার টিভি।

খাটের ওপর তিন ফুট উঁচু গদির ওপর যিনি শুয়ে আছেন তিনি যে রমেন লাহা সেটা বলে না দিলেও চলে। বয়সটা কম আর স্বাস্থ্যটা ভাল হলে অবিকল সুবিমলের জোড়া মনে হত। দেখেই বোঝা যায় রোগে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছেন। মুখ শীর্ণ, চামড়া কুঁচকে গেছে, চুলের বেশিটাই সাদা, তবু এই অবস্থাতেও পোশাকে আশাকে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির পরিপাটি বাবুটি।

সুবিমল আলাপ করিয়ে দিতে রমেন লাহা হাতজোড় করে বললেন, 'বসুন মা, আপনিও বসুন বাবা—' বলে সোফাগুলো দেখিয়ে দেন। তাঁর কাছে যে দর্শনার্থীরা আসে, ওগুলো যে তাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

রণিতা আর অমিতেশ নমস্কার জানিয়ে বসে পড়ে। রণিতা বলে, 'আমরা অনেক ছোট। তুমি করে বলুন।'

রমেন একটু হাসেন শুধু। তারপর বলেন, 'অপরাধ ক্ষমা করবেন। কোমর থেকে নিচের দিকের পুরোটাই আর্থারাইটিসে পঙ্গু হয়ে আছে। বসতে পারি না, শুয়ে শুয়েই আমাকে কথা বলতে হবে।'

বোঝা যায় যে কোনো বয়সের অনাত্মীয়দের আপনি করে বলাটা রমেন লাহার অভ্যাস। আপত্তি করলেও শুনবেন না। রণিতা আর অমিতেশ ব্যস্তভাবে বলে, 'না না, আপনাকে উঠে বসতে হবে না। শুয়ে শুয়ে কথা বলুন, আমরা কিছু মনে করব না।'

একটি বয়স্ক কাজের মেয়ে বড় সাইজের সন্দেশ, রাজভোগ, কাজু বাদাম আর কফি দিয়ে যায়। খুব সম্ভব আগেই বলা ছিল।

দারুণ বনেদি শিষ্টাচার বাবা এবং ছেলের। বিনীতভাবে বলেন, 'খান।'

কয়েকটা করে কাজু, একটা করে সন্দেশ আর কফির কাপ তুলে নেয় রণিতারা। রমেন বা সুবিমল আরও মিষ্টি-টিষ্টি নেবার জন্য জোর করেন না। তাঁরা জানেন পীড়াপীড়ি করাটা অশিষ্টতা।

রমেন রণিতাকে বলেন, 'আমার হাল তো দেখছেন। আজকাল বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করি না, আসলে শরীরটা সব গোলমাল করে দিয়েছে কিন্তু

আপনার বাবা মানে ইন্দ্রনাথবাবু ছেলের মারফত অনুরোধ করেছেন আপনাকে খানিকটা সময় দিতে হবে। তাঁর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমার নেই।'

অভিভূত রণিতা বলে, 'আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব!'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন রমেন, 'কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন নেই। ইন্দ্রনাথবাবু অতি সজ্জন, পণ্ডিত মানুষ। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি। যতদিন সুস্থ ছিলাম প্রায়ই 'মুনলাইট'-এ থিয়েটার দেখতে আসেতেন। নাটকের দুর্দান্ত সমঝদার। ছেলে যখন ওঁর কথা বলল আমি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলাম।' একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করেন, 'সুবিমল বলছিল, আপনারা আমার কাছে নয়নতারা সম্পর্কে জানতে চান।'

রণিতা বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সুবিমল দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, 'আপনারা বাবার সঙ্গে কথা বলুন। আমার জরুরি একটা কাজ আছে। বেরুতে হবে।'

রমেন বলেন, 'ড্রাইভারদের কাউকে বলে দিও, কথা হয়ে গেলে ওঁরা যেখানে যেতে চান সেখানে যেন পৌঁছে দেয়।'

এটাই হয়তো এ বাড়ির নিয়ম, তাই রণিতারা আপত্তি করে না। সুবিমল বলেন, 'জগমোহনকে বলে যাচ্ছি।'

সুবিমল চলে গেলে রমেন রণিতাদের দিকে চোখ ফেরান, 'কী জানতে চান বলুন—'

রণিতা ডকু-ফিচারটা সম্পর্কে সব জানিয়ে বলে, 'নয়নতারা যে একুশটা নাটকে অভিনয় করেছিলেন তার পনেরো ষোলটা তো আপনারা প্রোডিউস করেছেন?'

শুধরে দিয়ে রমেন বলেন, 'সতেরোটা।'

'নয়নতারা কিভাবে স্টেজে এলেন, থিয়েটারে তাঁর পারফরমেন্স কেমন, কিরকম ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবন, এ সব সম্পর্কে আপনার যা যা মনে আছে বলুন। কিছু বাদ দেবেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিলেন রমেন লাহা। তারপর শুরু করলেন। তাঁর বলার ভঙ্গিটি চমৎকার, কোনোরকম তাড়াহুড়ো নেই। ধীরে ধীরে নয়নতারার অন্য এক ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

নয়নতারা তাঁর অভিনয় জীবন আরম্ভ করেছিলেন ফিল্ম দিয়ে। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা ছবিতে নায়িকার রোল করার পর তাঁকে স্টেজে নিয়ে আসেন রমেন লাহা। নয়নতারার বিপুল জনপ্রিয়তা আর গ্ল্যামারকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন তিনি। সেদিক থেকে তাঁর পরিকল্পনা শতকরা একশ' ভাগ সফল।

নয়নতারা স্টেজে যোগ দেবার আগে বেশ কয়েক বছর থিয়েটারের হাল খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে 'মুনলাইট'-এর অবস্থা কহতব্য নয়। পর পর নাটক মার খাচ্ছিল। টায়টোয় প্রোডাকশনের খরচটাও উঠত কিনা সন্দেহ। আসলে দর্শকরা নাটক সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। নয়নতারা স্টেজে আসার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারে 'একটা চনমনে ভাব দেখা দিল। এর সুফল শুধু রমেনবাবুরাই নন, অন্য থিয়েটার কোম্পানিগুলোও পেল। ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শক থিয়েটার পাড়ার দিকে আসতে লাগল। 'মুনলাইট'-এর যে সতেরোটা নাটকে নয়নতারা অভিনয় করেছেন তার প্রত্যেকটা রেকর্ড ব্যবসা করেছে। পরে অবশ্য 'এপিক থিয়েটার' অনেক বেশি টাকা দিয়ে তাঁকে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। ওদের চারটে নাটকও চুটিয়ে ব্যবসা করেছে।

ফিল্ম থেকে স্টেজে এসে গোড়ার দিকে একটু অসুবিধা হয়েছিল নয়নতারার। কেননা থিয়েটার অ্যাক্টিংটা একেবারে ভিন্ন ধরনের। ফিল্মে ভুলচুক হলে শুধরে নেওয়া যায় কিন্তু স্টেজে তার সুযোগ নেই। উন্মুখ দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে একবারেই যা করার করতে হবে। প্রথম তিনটে শো-এ সংলাপ ভুলে গিয়েছিলেন নয়নতারা, প্রম্পটার উইংসের পাশ থেকে খেই ধরিয়ে দেবার পর অবশ্য তাড়াহুড়ো করে সেগুলো বলেছেন কিন্তু অভিব্যক্তিতে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তিনটে শো-এর পর আর কোনো ত্রুটি ছিল না। অসীম একাগ্রতায় স্টেজ অ্যাক্টিংটা চমৎকার রপ্ত করে নিয়েছিলেন নয়নতারা। অভিনয় বলতে তাঁর কাছে শুধু পরিচালকের নির্দেশমতো নিখুঁতভাবে হাত-পা নাড়া বা সংলাপ বলে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে তিনি মেশাতেন আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব আর সৃজনশীলতা যা শুধু একজন মহান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

কাজের প্রতি নয়নতারার নিষ্ঠা ছিল অভাবনীয়। যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করতেন, তাতে একেবারে মগ্ন হয়ে যেতেন। সেখানে এতটুকু ফাঁকি নেই। ফিল্ম প্রোডিউসারদের মতো রমেনবাবুও জানালেন, নয়নতারা ছিলেন অত্যন্ত 'ডিসিপ্লিনড' আর 'পাংচুয়াল।' ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে তিনি শো-টাইমের আগে হল-এ আসতেন, নিজের সাজঘরে বসে মেক-আপ নিতেন। শো-এর পর এক মিনিটও নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যেতেন। দশ বছরে সতেরোটা নাটক করেছেন কিন্তু নেহাত অসুস্থ হয়ে না পড়লে সময়ের এতটুকু হেরফের কখনও হয়নি।

রমেনবাবু প্রায় পঞ্চাশ বছর থিয়েটারে ছিলেন, তাঁর হাড়ে-মজ্জায় নাটক। পুরনো আমলের তিনকড়ি দাসী, বিনোদিনী বা তারাসুন্দরীদের কথা বলতে

পারবেন না, তবে তাঁর দেখা অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নয়নতারা। এঁর মতো শিল্পী গত অর্ধ শতাব্দীতে আর দেখা যায়নি।

'মুন লাইট'-এ যোগ দেবার পরও ফিল্ম ছাড়েননি নয়নতারা। এই সময়টা তাঁর জীবনের 'পিক পিরিয়ড'। একদিকে যেমন অজস্র টাকা, খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে তাঁকে ঘিরে তখন প্রচুর কুৎসা। তা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের মক্ষীরানীদের নিয়ে এসব তো রটেই। তবে সত্যমিথ্যা জানেন না রমেনবাবু।

বোঝা যাচ্ছিল, মেয়ের বয়সী রণিতাকে নয়নতারার স্ক্যাণ্ডাল নিয়ে কিছু বলতে তাঁর রুচিতে বাধছিল। প্রসঙ্গটা তিনি দ্রুত থামিয়ে দেন।

রণিতা এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করে না। বলে, 'আচ্ছা, এতগুলো নাটকে যে নয়নতারা অভিনয় করেছেন তার কোনো ভিডিও বা ফিল্ম করে কি রাখা হয়েছে?'

চোখ কুঁচকে মনে করতে চেষ্টা করেন রমেনবাবু। তারপর বলেন, 'কেষ্টপদ ঘোষাল বলে একজন নয়নতারার দুটো নাটকের ভিডিও করেছিল বছর দশেক আগে।'

'সে দুটো কি এখনও ঠিক আছে? নষ্ট হয়ে যায়নি?'

'ও প্রতি বছর ক্যাসেট পালটে পালটে প্রিজার্ভ করে যাচ্ছিল। লাস্ট ইয়ারে কি তার আগের ইয়ারে প্রোজেকসান করে এই ঘরে আমাকে দেখিয়েও গিয়েছিল। তবে সেগুলোর হাল এখন কী দাঁড়িয়েছে, বলতে পারব না।'

'কেষ্টপদবাবুর ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে?'

'নিশ্চয়ই। ওর ফোনও আছে।' বলে পড়ার টেবলের ওপর একটা লাল রঙের ডায়েরির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেন রমেনবাবু, 'একটু কষ্ট করে যদি ওটা আনেন—'

অমিতেশ ডায়েরিটা নিয়ে আসে। সেটার পাতা উলটে উলটে একটা নম্বর বার করে অমিতেশকে বলেন, 'এটা ধরে দয়া করে ফোনটা আমাকে দিন।'

একবার ডায়াল করেই কেষ্টপদকে পাওয়া গেল। রমেনবাবু তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, ক্যাসেট দুটো ভালই আছে। রণিতাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে আপনারা দেখতে চান?'

রণিতা বলে, 'কেষ্টপদবাবুর অসুবিধে না হলে আজই দেখতে পারি।'

'কখন দেখবেন?'

'উনি রাজি হলে আপনার এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ওঁর কাছে চলে যাব।'

কেষ্টপদকে সেই কথাই বলা হল। সেই সঙ্গে নাটক দেখার উদ্দেশ্য-ও। কেষ্টপদ জানাল, রণিতাদের জন্য অপেক্ষা করবে। যতক্ষণ না তারা যাচ্ছে, বাড়ি থেকে বেরুবে না।

রমেনবাবু ফোন নামিয়ে রেখে বলেন, 'আমার কাছে আর কিছু জানার আছে?'

'এক্ষুনি মনে পড়ছে না। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের আরেক দিন আসতে হবে।'

'যখন ইচ্ছা ফোন করে চলে আসবেন। কিন্তু যে ব্যাপারের কথা বললেন সেটা কী?'

'আমার ডকু-ফিচারের শুটিং যখন শুরু হবে তখন নয়নতারার স্টেজ-কেরিয়ার সম্পর্কে আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব। ওটা ছবিতে থাকবে।'

রমেন লাহা মৃদু হাসেন। বলেন, 'আবার আমাকে কেন?'

রণিতা বলে, 'আপনাকে বাদ দিয়ে নয়নতারার লাইফ ইনকমপ্লিট। আমার ছবিতে আপনাকে থাকতেই হবে।'

রমেন আর কিছু বলেন না।

রণিতা এবার বলে, 'আট বছর নয়নতারা নিরুদ্দেশ হয়ে আছেন। ওঁকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, আপনার ধারণা আছে?'

রমেন লাহা অস্তে মাথা নাড়েন, 'না, একেবারেই না। আমি তো শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি দু'বছর। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ একরকম নেই বললেই হয়। নয়নতারার খবর কিভাবে পাব?' একটু থেমে বলেন, 'ওঁর মতো আর্টিস্ট অভিনয় ছেড়ে দিলেন, এটা আমাদের মস্ত বড় ক্ষতি।' তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে।

আরো কিছুক্ষণ পর কেষ্টপদ ঘোষালের ঠিকানা নিয়ে অমিতেশ আর রণিতা বিদায় নেয়।

সুবিমল আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ওঁদের ড্রাইভার জগমোহন বেলেঘাটার এক গলিতে কেষ্টপদ ঘোষালদের শ্যাওলা-ধরা, পুরনো, ভাঙাচোরা একতলা বাড়ির সামনে রণিতাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায়।

সামনের শান-বাঁধানো রোয়াকে তাদের জন্য বসে ছিলেন কেষ্টপদ। গায়ের রং বেশ কালো। মাঝারি হাইটের তেউড়ে-যাওয়া, ক্ষয়াটে চেহারা ভদ্রলোকের। বিখ্যাত থিয়েটার হল-এর মালিক এবং প্রোডিউসার রমেন লাহা ফোন করে

রণিতাদের কথা বলেছেন, তাই যথেষ্ট খাতির করে একটা ঘরে এনে ওদের বসান কেষ্টপদ।

কথায় কথায় জানা যায়, কেষ্টপদ ঘোষাল নাটক এবং ফিল্মের একজন স্টিল ফোটোগ্রাফার। নানা ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজে ফোটো বিক্রি করাটাই তাঁর জীবিকা। তবে ক'বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্যাসেটও করছেন। এতে রোজগারটা অনেক বেড়েছে। কেষ্টপদ বেশ দূরদর্শী। তাঁর মনে হয়েছিল নয়নতারার নাট্যাভিনয়ের ক্যাসেট করে রাখা দরকার, ভবিষ্যতে এর চাহিদা হবে বিপুল, দামও পাওয়া যাবে প্রচুর। তবে নানা কারণে দুটোর বেশি ক্যাসেট করা যায়নি। আর সে দুটো সম্ভব হয়েছিল রমেন লাহার অনুগ্রহে। সেজন্য তিনি কোনো অনুরোধ করলে না বলতে পারেন না কেষ্টপদ।

এরপর দুই নাটকের ক্যাসেট দেখানো হয়। কী বিরাট ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী যে নয়নতারা সেটা ক্যাসেট দেখতে দেখতে টের পাচ্ছিল রণিতারা। স্ক্রিন-পার্সোনালিটির মতো তাঁর স্টেজ পার্সোনালিটিও এক কথায় দুর্দান্ত।

নাটক দেখা শেষ হল বিকেল পাঁচটায়। এর ভেতর কোন কোন অংশ ডকু-ফিচারে কাজে লাগাবে, টুকে নিয়েছে রণিতা। সে বলে, 'আপনার ক্যাসেট থেকে দু'চারটে ছোট ক্লিপিং আমাদের ছবিতে ব্যবহার করতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

কেষ্টপদ বলে, 'না না। রমেনবাবু আপনাদের পাঠিয়েছেন। যতগুলো ইচ্ছা নিতে পারেন।'

রণিতা বলে, 'এর জন্যে আমরা কিছু টাকা দেব। আপনি কিরকম আশা করেন?'

কেষ্টপদ একমুখ হাসে। বলে, 'আবার টাকা কেন? তা আপনাদের যখন ইচ্ছে যা ভাল মনে করেন দেবেন।'

'কতটা কী দেওয়া যায়, আমরা একটু ভাবি। তারপর পেমেন্টের ব্যবস্থা করব।'

আট

আরো দশ দিন পরও অবস্থার কোনোরকম হেরফের নেই। পুলিশ এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু নয়নতারাকে পাওয়া যায়নি। তবে রণজয় আগের মতোই আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে খুঁজে বার করবেনই।

'দিনকাল'-এর বক্স নাম্বারে দ্বিতীয় নোটিশটাও এর ভেতর বেরিয়ে গেছে। ফলে চিঠির বান ডেকেছে। রোজ পঞ্চাশ ষাটটা করে চিঠি আসছে। তবে প্রয়োজনীয় তথ্য তার কোনোটাতেই নেই। অবশ্য একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী আর একজন বড় কনট্রাক্টর-কাম-প্রোমোটারের স্ত্রী দুটো চমকপ্রদ চিঠি লিখেছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী মল্লিকা আগরওয়ালের বক্তব্য, নয়নতারার একটা হিপনোটিক পাওয়ার আছে, সেকালের মোহিনীদের মতো সে ছলাকলা তুকতাক জানে। সে এমনই বশীকরণ করেছিল যে মল্লিকার স্বামী কিষেণলাল আগরওয়াল একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তাকে পাবার জন্য তিনি যাবতীয় প্রোপার্টি আর কোম্পানির শেয়ার তার নামে লিখে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইন্ডাস্ট্রি সার্কেলে এই নিয়ে প্রচণ্ড হই-চই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে মুখ দেখানো যাচ্ছিল না। নিরুপায় মল্লিকা তখন পুলিশ কমিশনার, হোম সেক্রেটারি আর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কখনও ভয় দেখিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত কিষেণলালের মোহ কাটিয়ে দেন। আগরওয়াল বংশ একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারি থেকে রক্ষা পায়। তাঁদের বিষয় সম্পত্তিও হাতছাড়া হয় না। এরপর থেকে মল্লিকা তাঁর স্বামীকে চোখে চোখে রাখছেন, এক পলকের জন্য হাতের মুঠো থেকে বেরুতে দেন না।

কনট্রাক্টর-কাম-প্রোমোটারের স্ত্রী রাজেশ্বরী তরফদার জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী উমাপতি তরফদারও নয়নতারার জন্য ঘাড় গুঁজে পড়েছিলেন। তিনি কিন্তু পুলিশ কমিশনার বা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছোটাছুটি করেন নি, কোমরে আঁচল জড়িয়ে সোজা নয়নতারার বাড়িতে চড়াও হয়েছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই নাকি জুতো পেটা করে তাঁর বিষ ঝেড়ে দিয়েছিলেন। স্বামীকেও রেয়াত করেন নি, নিজেদের পাড়ায় তুমুল চেঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করে ফেলেছিলেন। তারপর উমাপতির কুকীর্তি সাতকাহন করে তাদের জানিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর উমাপতি এক মাস বাড়ির বার হতে পারেন নি। রাজেশ্বরীর আগুনখাকির মতো চেহারা দেখে নয়নতারা আর উমাপতি নাকি একেবারে মিইয়ে গিয়েছিলেন।

এর মধ্যে সাতজন পরিচালকের সঙ্গে দেখা করেছে রণিতা আর অমিতেশ। তাঁদের কাছ থেকেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। থিয়েটারের রমেন লাহা বা সিনেমার প্রোডিউসাররা যা বলেছেন হুবহু তাই জানিয়েছেন ওঁরা।

ফিল্মের যে দুই হিরো একদা নয়নতারার জন্যে ডুয়েল লড়েছিলেন তাঁরা হলেন চিরঞ্জীব এবং অমলকুমার। দু'জনেই একসময় ছিলেন ম্যাটিনি আইডল। ওঁদের সঙ্গেও দেখা করেছে রণিতারা।

চিরঞ্জীব আর অমলকুমার, দু'জনেরই বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দুটো ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের পর চিরঞ্জীব অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী মারা গেছেন ক' বছর আগে। এখন দুই ছেলে, দুই পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি আর পুরনো সোনালি দিনের স্মৃতি নিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ অবসরের জীবন। বই পড়ে, টি-ভি দেখে, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খুনসুটি করে সময় কেটে যায়।

অমলকুমার অবশ্য অভিনয় ছাড়েন নি। ছোট্ট ফ্যামিলি তাঁদের। তিনি আর স্ত্রী। একমাত্র ছেলে কানাডার ন্যাশনালিটি নিয়েছে, এদেশে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই। সত্তরেও পুরোপুরি সুস্থ আছেন, মজবুত স্বাস্থ্য, একটা দাঁতও পড়েনি। চুল অবশ্য সাদা হয়ে গেছে। টাকা-পয়সার অভাব নেই কিন্তু সময় তো কাটাতে হবে, তাই অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বয়সে সিনেমার নায়ক হওয়া যায় না। নায়কের কাকা, বাবা ইত্যাদি রোল নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

চিরঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করে রণিতারা নয়নতারার প্রসঙ্গ তুলতে তিনি তাঁর এক কালের নায়িকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু অমলকুমারের সঙ্গে সেই পিস্তলের লড়াই সম্পর্কে জানতে চাইলে একেবারে হকচকিয়ে যান। বিব্রতভাবে বলেন, 'পাস্ট ইজ পাস্ট। প্লিজ ও ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করো না। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে শেষ জীবনে শান্তিতে আছি। সবাই আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে কী হয়েছিল, কী করেছিলাম, সে সব এতদিন বাদে খুঁচিয়ে বার করে পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে কী লাভ?'

কাজেই আর কোনো প্রশ্ন করেনি রণিতা।

অমলকুমারের জীবনদর্শন একেবারে উলটো। তাঁর কাছে গিয়ে নয়নতারার কথা তুলতে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। বলেন, 'মিডিয়া শুধু নায়ক নায়িকাদের নিয়ে মাতামাতি করে। আমরা ক্যারেক্টার আর্টিস্টরা তাদের চোখে ফালতু। লোকে আমাকে প্রায় ভুলেই গেছে কিন্তু আমিও একদিন হিরো ছিলাম রে বাবা—যাকে বলে ম্যাটিনি আইডল। এই সুযোগে একটা জব্বর পাবলিসিটি পেয়ে যাব, না কী বল?'

রণিতা একটু হাসে।

অমলকুমার বলেন, 'আই অ্যাম নট আ পিউরিটান। আমার কোনো শুচিবাই নেই। নয়নতারা ছিল সেক্স বম্ব। এমন ভোলাপচুয়াস উইম্যান আমার জীবনে আর কখনও দেখিনি। এর জন্যে মানুষ সর্বস্ব বাজি ধরতে পারে। আমিও ধরেছিলাম। কিন্তু আমার একজন রাইভ্যাল ছিল—অ্যানাদার ম্যাটিনি আইডল চিরঞ্জীব। সেই সময়ের কাগজপত্র যদি নাড়াচাড়া কর দেখতে পাবে নয়নতারার

জন্য আমরা ডুয়েল লড়েছিলাম। আমি সিরিয়াসলি উন্ডেড হয়েছি। নয়নতারার মতো একটি নারীর জন্যে প্রাণ দিয়েও সুখ। এক হিরোইনকে নিয়ে দুই হিরোর পিস্তল-যুদ্ধ হয়েছে। তার ফলে সারা দেশ জুড়ে কী ধরনের সেনসেসন হতে পারে, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ।'

রণিতা মাথা হেলিয়ে বলে, 'তা পারছি। তারপর কী হল?'

ঠোঁট টিপে, চোখ আধাআধি বুজে, মুখে ফিচেল হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে অমলকুমার বলেন, 'অশ্বডিম্ব, কিছুই হল না। পুলিশ ভয় দেখালে নয়নতারার আশা ছেড়ে দিয়ে চিরঞ্জীব আর আমি যদি নিজেদের মধ্যে আপস করে না নিই, কেসটা কোর্ট পর্যন্ত গড়াবে। দু'জনেরই জেল-টেল হয়ে যেতে পারে। সুনাম তো যথেষ্টই নষ্ট হয়েছে, ভবিষ্যৎ ও নষ্ট হয়ে যাবে। জেলফেরত দাগী লোকেদের সোসাইটিতে জায়গা নেই। সুড় সুড় করে দু'জনে যে যার ফ্যামিলির খাঁচায় ঢুকে পড়লাম। মাঝখান থেকে নয়নতারার সঙ্গে ছবি করা বন্ধ হয়ে গেল। সে অন্য হিরোর সঙ্গে কাজ করতে লাগল।'

'এরপর নয়নতারার সঙ্গে আর দেখা হয় নি?'

'হয়েছে কয়েক বার। কিন্তু সে কথা বলে নি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি যা বললেন তা কি আমার ডকু-ফিচারে রাখতে পারি?'

অমলকুমার বলেন, 'সবটা। একটা কমা, সেমিকোলনও বাদ দেবে না। আজকের জেনারেশন জানুক এক সময় আমার মধ্যেও বারুদ ছিল।'

মণিময়ের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে এর মধ্যে রণিতা আর অমিতেশ টালিগঞ্জে কুদঘাটের কাছে নয়নতারার শ্বশুরবাড়িতেও গিয়েছিল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেনি।

একটি লোক— পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, থলথলে ভারি চেহারা, নাকের নিচে চৌকো গোঁফ, চোয়াড়ে মুখ, চোখে চতুর চাউনি—দরজা খুলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাকে চান?'

মণিময় জানিয়ে দিয়েছিলেন, নয়নতারার শ্বশুর এবং স্বামী বেঁচে নেই। তাঁর এক দেওর, নাম অবিনাশ, এখন বাড়ির কর্তা। রণিতারা যেন তার সঙ্গে দেখা করে, তবে লোকটা খুব সুবিধার নয়।

রণিতা বলে, 'অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করব।'

'আমিই অবিনাশ। কী দরকার?'

'ফেমাস অ্যাকট্রেস নয়নতারা দেবী তো আপনাদের আত্মীয়। ওঁর সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আছে।'

অবিনাশের জোড়া লোমশ ভুরু কুঁকড়ে যায়। কর্কশ গলায় সে বলে, 'ওই বেশ্যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা যেতে পারেন।' বলে দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

এমন অভদ্র, ইতর লোক আগে আর কখনও দেখেনি রণিতারা। ছবির জন্য মেটিরিয়াল জোগাড় করতে এসে ভালই অভিজ্ঞতা হল।

দাঁতে দাঁত চেপে অমিতেশ শুধু বলে, 'স্কাউন্ড্রেল।'

নয়

ডকু-ফিচারের কাজ কতটা এগুচ্ছে, সারা দিনে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে কী ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে, তার খুঁটিনাটি বিবরণ রোজ রাতে খাবার টেবলে বসে রণিতাকে দিতে হয়। সব শোনার পর নানারকম পরামর্শ দেন ইন্দ্রনাথ। আজ খাওয়ার পর দোতলায় উঠে সোজা রণিতার সঙ্গে তার ঘরে চলে এলেন তিনি। বলেন, 'তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা বাবা?'

'সেই ছেলেটিকে কবে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবি?'

ইন্দ্রনাথ যে অমিতেশের কথা বলছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না রণিতার। তার মতো ঝকঝকে, স্মার্ট মেয়েও বেশ একটু লজ্জা পায়, তার মুখে পলকের জন্য রক্তাভা ফুটে ওঠে। মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে, 'তুমি যেদিন বলবে।'

একটু চিন্তা করে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ধর, পরশু দিন।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'অমিতেশকে বাড়িতে নিয়ে আসব?'

ইন্দ্রনাথ চকিত হয়ে ওঠেন, 'না না, বাড়িতে না। তোর মা আছে এখানে, মুশকিল হয়ে যাবে।'

'তবে?'

'কোনো ভাল রেস্তোরাঁয়। ধর, আমি ছেলেটিকে চা খেতে ইনভাইট করছি।'

বাবার মুখের দিকে তাকায় রণিতা। মজার গলায় বলে, 'তুমি খুব মডার্ন হয়ে গেছ বাবা।'

'মানে?'

'নইলে কেউ রেস্তোরাঁয় ইনভাইট করে!'

ইন্দ্রনাথ সামান্য হেসে বলেন, 'বাড়িতে আনার উপায় নেই। তোর কাকা কি পিসিদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। হাজার রকমের কৌতূহলের জবাব দিতে হবে। পার্কে কি ভিক্টোরিয়ার বাগানে নিয়েও ছেলেছোকরাদের মতো বসতে পারি না। তাই—'

'বুঝেছি—' রণিতাও হেসে ফেলে। পরক্ষণে তাকে বেশ চিন্তিত দেখায়। বলে, 'আচ্ছা বাবা—'

'কী রে?'

'তুমি বলেছিলে আমাদের রিলেটিভদের সব জানিয়ে অমিতেশের সঙ্গে কথা বলবে—'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, অমিতেশের সঙ্গে আগেই কথাটা বলি। একটা কাজ এগিয়ে রাখি।'

'পরশু কোন রেস্তোরাঁয় ওকে যেতে বলব?'

'তোরাই ঠিক করে আমাকে বলিস। আমি চলে যাব। বিকেলের দিকে হলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রণিতা বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'কর না—'

'তুমি বোধ হয় দেখে নিতে চাইছ আমার সিলেকসান ঠিক হয়েছে কিনা—'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না, শুধু একটু হাসেন।

এক দিন পর সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁর এক কোণে অমিতেশের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দেবার জন্য একটা টেবল বুক করে রেখেছিল রণিতা। পাঁচটায় ইন্দ্রনাথের আসার কথা। তার অন্তত মিনিট পনের আগে এসে অমিতেশ আর সে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে। রণিতা খুব ভাল করেই জানে ইন্দ্রনাথ খুবই সময়ানুবর্তী মানুষ, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে তাঁর

দৈনন্দিন রুটিন ঠিক করা থাকে, সময়ের এতটুকু এদিক ওদিক হলে তিনি বিরক্ত হন।

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় চলে এলেন ইন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে অমিতেশের আলাপ করিয়ে দিতে অমিতেশ ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ছেলেটা যে দুর্বিনীত নয়, বরং যথেষ্ট বিনয়ী, এক নজর দেখেই ইন্দ্রনাথের মনে হল। আজকালকার ছোকরারা পরিচয় করিয়ে দিলে হ্যালো বলে, বড় জোর হাতজোড় করে নমস্কার করে। অমিতেশ তাদের মতো নয়। প্রণামটা ইন্দ্রনাথকে খুশি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু খটকাও লাগে। তাঁর মেয়ে খুবই ধুরন্ধর, হয়তো সে-ই অমিতেশকে আগে থেকে প্রণামের ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছে। কোনটা তাঁর পছন্দ, কোনটা অপছন্দ, রণিতা তা ভালই জানে। ইন্দ্রনাথ একটা চেয়ারে বসে তাঁর দু'পাশে অমিতেশ আর রণিতাকে বসালেন। বললেন, 'কী খাবি বল?'

রণিতা বলে, 'তুমি খাওয়াবে মানে! তুমি তো আমাদের গেস্ট। আমরা তোমাকে খাওয়াব—'

হেসে হেসে হাত নাড়তে নাড়তে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক আছে।'

'ফ্রায়েড প্রন তো তোমার খুব পছন্দ। অডার দিই?'

'দে।'

স্টুয়ার্ডকে ডেকে ইন্দ্রনাথের জন্য প্রণ আর নিজেদের জন্য চিকেন কাটলেট আর কফির অর্ডার দেয় রণিতা।

খাবার আসার আগেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমিতেশ এবং তার মা এবং বোন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নেন ইন্দ্রনাথ। তাঁর মনে হয় পরিবারটি ভাল, শিক্ষিত এবং কালচারড। ওখানে গেলে রণিতার কোনোরকম অসুবিধা হবে না, বরং সে যেভাবে নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলতে চায় তার পুরোপুরি সুযোগ পেয়ে যাবে। তবু নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আর ছোট খুকির ব্যাপারটা আমি জানি। ছোট খুকি আমার কাছে কিছু গোপন করে নি।'

অমিতেশের মুখে লালচে একটু আভা ফুটে ওঠে। লাজুক হেসে সে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায়।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ছোট খুকি যে ফিল্মটাকেই কেরিয়ার করতে চায়, সেটা কি তোমার মা জানেন?'

অমিতেশ বলে, 'হ্যাঁ, জানে।'

'এ এমন একটা কাজ যাতে অনেক সময় বাইরে বাইরে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে বেরুনো বা ফিরে আসার ঠিক থাকে না। তা ছাড়া আউটডোরে শুটিং

থাকলে দশ পনের দিন কি তারও বেশি বাড়িতে আসাই হল না। এ সব কি তোমার মা আর আত্মীয়স্বজনরা মেনে নেবেন?'

অমিতেশ জানায়, রণিতা মাঝে মাঝেই তাদের বাড়ি যায়। তার কাজকর্মের পদ্ধতি মায়ের অজানা নয়। মা একেবারেই পুরনো ধ্যানধারণাকে প্রশ্রয় দেন না। তিনি আধুনিক, সংস্কারমুক্ত, ঝকঝকে মানুষ। মেয়েরা নানা ব্যাপারে পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠছে, তাদের পাশাপাশি এমন সব দুঃসাহস এবং পরিশ্রমের কাজ করছে যা কুড়ি পঁচিশ বছর আগে ভাবাও যেত না। এদের সম্বন্ধে মায়ের খুব শ্রদ্ধা। মেয়েরা ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকবে, এটা তিনি একেবারেই চান না। তারা কারো স্ত্রী, কারো মা, কারো পুত্রবধূ তো হবেই, সেই সঙ্গে নিজেদের আলাদা আলাদা আইডেনটিটি গড়ে তুলুক, সোসাইটিতে তাদের নিজস্ব পরিচিতি হোক—এর ওপর মা খুব জোর দেন।

অমিতেশ বলে, 'রণিতা যখনই আমাদের বাড়ি যায়, মা ওকে কাছে বসিয়ে ও কী করছে, ফিউচার পরিকল্পনা কী, সব জিজ্ঞেস করে। ফিল্মের ব্যাপারে মায়ের ভীষণ উৎসাহ। মা মনে করে এর চেয়ে পাওয়ারফুল মিডিয়াম এখন আর কিছু নেই। সেলুলয়েডে অনেক বড় বড় কাজ করা যায় যা কিনা সোসাইটিকে আগাগোড়া নাড়িয়ে দিতে পারে।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'মায়ের যেরকম ইন্টারেস্ট, শরীরটা ভাল থাকলে হয়ত রণিতার সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে নেমে পড়ত।'

ইন্দ্রনাথ হাসেন। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন, 'এবার তোমার কথা বল—'

একটু থতমত খেয়ে যায় অমিতেশ। বলে, 'আমার কী কথা?'

'তুমি কি জার্নালিজমেই স্টিক করবে?'

'হ্যাঁ, প্রিন্ট মিডিয়া আমি ছাড়তে চাই না।'

'অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়ার সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। টেলিভিসন অনস্লট শুরু হয়ে গেছে, নতুন নতুন চ্যানেল ওপেন করা হচ্ছে, তার জন্য একটা খবরের কাগজও কি বন্ধ হয়েছে? উলটে সারা দেশে নতুন নতুন কাগজ বেরুচ্ছে। অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়ার দাপট যতই হোক না, প্রিন্ট মিডিয়াকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। মানুষের পড়ার হ্যাবিট চিরকালই থাকবে।'

'কেরিয়ার হিসেবে জার্নালিজম কি খুব লুক্রেটিভ?'

'আমার তো সেই রকমই ধারণা।'

'একজন আই এ এস, আই পি এস-এর মতো?'

'যদি আর্থিক দিক থেকে বলেন তা হলে বলব তার চেয়েও বেশি লুক্রেটিভ এবং গ্ল্যামারাস।'

'যেমন?'

'একজন ভাল জার্নালিস্ট বিশ পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত স্যালারি পেতে পারে। ইংলিশ ডেইলিগুলো রিজিওন্যাল লাংগুয়েজ ডেইলির চেয়ে অনেক বেশি পে করতে পারে, কেননা সারা দেশ জুড়ে ওগুলোর মার্কেট। কোনো কোনোটার তো বিদেশেও প্রচুর ডিম্যান্ড রয়েছে। আপনি শুনলে অবাক হবেন, রিসেন্টলি আমার এক বন্ধু দিল্লির একটা কাগজে চল্লিশ হাজার টাকা মান্থলি স্যালারির অফার পেয়েছে।'

খবরের কাগজ যে এতটা এগিয়েছে, ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল না। সত্যিই তিনি অবাক হয়ে যান।

অমিতেশ বলে, 'তা ছাড়া কোনো জার্নালিস্ট সেনসেসানাল বা সিরিয়াস কিছু লিখলে রাতারাতি তার নাম ছড়িয়ে যায়। একজন আই এ এস বা আই পি এস সারা জীবন চেষ্টা করলেও সেরকম ফেমাস হতে পারবে না। একে আপনি লুক্রেটিভ বা গ্ল্যামারাস বলবেন না?'

আস্তে মাথা নাড়েন ইন্দ্রনাথ।

অমিতেশ থামে নি, 'আই এ এস, আই পি এস-এর মতো ছেলেমেয়েরা আজকাল জার্নালিজমে আসছে। একটু খোঁজ করলে জানতে পারবেন কোনো ফার্স্ট ক্লাস ডেইলিতে ফার্স্ট ক্লাস না থাকলে আজকাল কাজ পাওয়া যায় না।'

রণিতা মজার চোখে বাবাকে লক্ষ করছিল। কৌশলে ইন্দ্রনাথ যে অমিতেশ সম্পর্কে সব জেনে নিচ্ছেন, সেটা বুঝতে তার অসুবিধা হয় নি। ইন্দ্রনাথের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি খুশিই হয়েছেন। মেয়ে যে অপাত্রে হৃদয় সঁপে দেয় নি সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি হয়তো শুনেছ, আমাদের ফ্যামিলি এবং আত্মীয়স্বজনেরা এখনও যথেষ্ট অর্থোডক্স। সে জন্যে তোমাদের কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে।'

মুখ নামিয়ে অমিতেশ বলে, 'রণি আমাকে সব বলেছে।'

'আশা করি, ধৈর্যর ফল ভালই হবে। আচ্ছা, আমি এবার উঠি। এনজয় ইওরসেলভস।' বলতে বলতে উঠে পড়েন ইন্দ্রনাথ।

দশ

ছবি এবং নাটক দেখা, খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করে তথ্য সংগ্রহ, ফিল্ম ট্রেডের সঙ্গে যুক্ত নানা লোকের ইন্টারভিউ নেওয়া, সবই হয়ে গেছে কিন্তু যাঁকে ছাড়া ডকু-ফিচারটা হওয়া একেবারেই সম্ভব নয় সেই নয়নতারা এখনও নিখোঁজ।

দিল্লি থেকে রজনী মাঝখানে বার চারেক ফোন করেছিল। মাণ্ডি হাউস তাড়া দিচ্ছে, রণিতা যত তাড়াতাড়ি পারে একবার দিল্লি এসে যেন ডকুমেন্টারির কনট্রাক্টটা ফাইনাল করে যায়। কিন্তু সে ঠিক করেছে, নয়নতারাকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত কোথাও যাবে না। আরো কয়েক দিন দেখবে সে, তার মধ্যে সন্ধান না পেলে প্রোজেক্টটা বন্ধ করে দিতে হবে।

ক্রমশ যখন হতাশ হয়ে পড়ছে রণিতা, সেই সময় বক্স নাম্বারে অদ্ভুত এক চিঠি এল। পুরনো আলিপুর থেকে লিখেছেন জনৈকা বিন্দুবাসিনী দেবী।

'মহাশয় বা মহাশয়া,

আমি একজন বৃদ্ধা, বয়স পঁচাত্তর। দীর্ঘকাল আমরা পুরাতন আলিপুরের বাসিন্দা। আমার স্বামী দশ বছর আগে স্বর্গীয় হইয়াছেন। আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। দু'জনেই বিবাহিত এবং প্রবাসী। ছেলে থাকে আমেরিকায়, মেয়ে জার্মানিতে। আলিপুরের বাড়িতে আমার এক অবিবাহিত দেওর এবং আমি থাকি। দেওর আমারই সমবয়সী।

আমি চলৎশক্তিহীন মানুষ, কয়েক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় ডান পা'টি হারাই। তার উপর বাতে এবং ব্লাড সুগারে পঙ্গু হইয়া আছি। সারাদিনই হুইল চেয়ারে বসিয়া কাটিয়া যায়। ক্বচিৎ ক্রাচও ব্যবহার করি। মাঝে মাঝে বই পড়ি, টিভি দেখি। আমার একটি দুরবীন আছে, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে ওটার মাধ্যমে আমার যেটুকু যোগাযোগ। এই শক্তিশালী বাইনোকুলারটা চোখে লাগাইয়া গাছগাছালি দেখি, পাখি দেখি, রাস্তাঘাট বাড়িঘর মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ করি।

এবার কাজের কথায় আসা যাক। আপনারা খবরের কাগজে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে জানাই, সম্প্রতি কয়েক মাস হইল আমাদের পাশের বাড়িতে নূতন লোকজন আসিয়াছে। সেদিন দুরবীন দিয়া ওই বাড়ির ভিতরটা দেখিতে ছিলাম। এভাবে দেখাটা অন্যায় এবং কুরুচিকর কিন্তু যাহা করিয়াছি সম্পূর্ণ কৌতূহল বশেই, ইহার মধ্যে কোনোরকম দুরভিসন্ধি ছিল না। লক্ষ করিতে করিতে হঠাৎ একটি মহিলাকে দেখিয়া চমকিত হইলাম। একদা সিনেমায় এবং মঞ্চে যাঁর

অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং এখনও টিভি-তে যাঁর ছবি দেখিয়া আগের মতোই তৃপ্তি পাই সেই নয়নতারা দেবীর সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট মিল আছে। জানি না, আমাদের নূতন প্রতিবেশিনী নয়নতারাই কিনা।

এই খবরটি আপনাদের কতদূর কাজে লাগিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি দরকারি মনে করেন যে কোনোদিন সকাল ন'টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে আসিতে পারেন। তখন বিস্তারিত কথা হইবে। আপনাদের কুশল কামনা করি।

নমস্কারান্তে,
বিন্দুবাসিনী দেবী
১২ রবিনসন স্ট্রিট
আলিপুর, কলিকাতা

বক্স নাম্বারের রোজকার চিঠি রোজ বিকেলে একটা প্যাকেটে পুরে রণিতাকে দেওয়া হয়। সে আর অমিতেশ সেগুলো নিয়ে দৈনিক 'দিনকাল'-এর লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে।

আজ বিন্দুবাসিনী দেবীর চিঠিটা দু'জনে বার তিনেক করে পড়ে। তারপর অমিতেশ বলে, 'সেই মহিলাটি যে নয়নতারা সেটা কিন্তু বিন্দুবাসিনী জোর দিয়ে লেখেন নি। বুড়ো মানুষ, ভুলও তো হতে পারে।'

রণিতা বলে, 'নিশ্চয়ই পারে। তবু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে চান্স একটা নেওয়াই যাক না।'

'ঠিক আছে। কবে যেতে চাও?'

ঘড়ি দেখে রণিতা বলে, 'এখন চারটে পঁয়ত্রিশ। বিন্দুবাসিনী পাঁচটার ভেতর দেখা করতে লিখেছেন। আজ গিয়ে লাভ নেই। কাল সকালে ন'টায় যাব। তুমি রাসবিহারীর মোড়ে মেট্রো রেল স্টেশনের কাছে সাড়ে আটটায় ওয়েট কোরো। আমি ওখানে চলে আসব। অটো-টটো কিছু একটা ধরে ওল্ড আলিপুরে দশ পনেরো মিনিটের ভেতর পৌঁছে যাব। বিন্দুবাসিনীর বাড়িটা খুঁজে বার করতে ম্যাক্সিমাম আরো পনেরো মিনিট।'

পরদিন অটো থেকে নেমে পনেরো নয়, পাঁচ মিনিটের ভেতর বারো নম্বর রবিনসন স্ট্রিট বার করে ফেলে রণিতারা। বিরাট কমপাউণ্ডওলা বাড়িটার গেটে যে বিহারী দারোয়ানটি অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল তার হাতে নিজেদের নাম লিখে একটা স্লিপ বিন্দুবাসিনী দেবীর কাছে পাঠিয়ে দেয় রণিতা। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে তাদের সঙ্গে করে দোতলার ব্যালকনিতে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

চিঠিতে নিজের ডেসক্রিপশনটা মোটামুটি ঠিকই দিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনী। হুইল চেয়ারে এই মুহূর্তে তিনি বসে আছেন। শীর্ণ রুগ্ণ চেহারা, পরনে ধবধবে সাদা ফিতে-পাড় শাড়ি থাকলেও বোঝা যায় ডান পা'টা নেই। চোখে পুরু লেন্সের চশমা, হাতে চওড়া সোনার চুড়ি, গলায় সরু হার। ডান পাশে একটা মাঝারি টেবলে খবরের কাগজ, কিছু বই, ট্রানজিস্টর, বাইনোকুলার, ম্যাগাজিন, কলম, ডট পেন, প্যাড, টেলিফোন ইত্যাদি। বোঝা যায় এসব নিয়েই তাঁর দিন কাটে। হুইল চেয়ারের বাঁ পাশে দড়ির তৈরি নিচু নিচু ক'টা গুজরাতি চেয়ার, ওগুলো দর্শনার্থীদের জন্য।

বিন্দুবাসিনী রণিতাদের বলেন, 'বসো।' তাঁর টেবলে সুইচ লাগানো রয়েছে। তিনি সেটা টিপতেই একটা কাজের লোক ছুটে আসে। তাকে দিয়ে রণিতাদের জন্য কফি আর বিস্কুট আনিয়ে বলেন, 'খাও—'

রণিতারা শুধু কফির কাপ তুলে নেয়।

বিন্দুবাসিনী এবার বলেন, 'চিঠিতে তোমাদের জানিয়েছি, এখন মুখেও বলছি, আমি যাঁকে দেখেছি তিনি হুবহু নয়নতারার মতো। একরকম চেহারার মানুষ কম হলেও মাঝে মাঝে দেখা যে যায় না তা নয়। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তোমাদের ছোটাছুটি কিন্তু সার হবে।'

অমিতেশ বলে, 'এ নিয়ে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। মহিলা নয়নতারা না হলে কী আর করা যাবে। আপনি নিজের থেকে সাহায্য করতে চেয়েছেন, সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

বিন্দুবাসিনী সামান্য হাসেন।

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'ক'বার ওঁকে দেখেছেন?'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'মাস চারেক ওঁরা এখানে এসেছেন, তার ভেতর বার তিনেকের বেশি নয়। প্রতিবারই দূরবীন দিয়ে।'

'মহিলা বাইরে বেরোন না?'

'আমি অন্তত দেখিনি।'

'আর কেউ ওঁকে দেখেছে বলে জানেন?'

বিন্দুবাসিনী অল্প হাসেন, 'এ পাড়ার লোকজনেরা প্রতিবেশীদের বাড়িতে কদাচিৎ যায়, আমাদের বাড়িতেও বড় একটা আসে না। অন্য কেউ মহিলাকে দেখে থাকলে আমি জানি না।'

কলকাতার এই নিরিবিলি অভিজাত অঞ্চলে বিশাল বিশাল কম্পাউণ্ডের মাঝখানে একেকটা বাড়ি দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি, কিন্তু পরস্পরের

সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই। বিন্দুবাসিনী যা বলেছেন সেটাই হয়তো ঠিক। এখানকাব বাসিন্দাদের অন্যের সম্বন্ধে মধ্যবিত্তসুলভ কৌতূহল নেই, কেউ কারো সঙ্গে বিশেষ মেশেটেশে না। রণিত জিজ্ঞেস করে, 'ওই মহিলার বাড়িতে কাউকে যাতায়াত করতে দেখেছেন?'

'কেন বল তো?'

'তা হলে তাদের সঙ্গে দেখা করতাম।'

'বুঝেছি। দেখা করে জেনে নিতে ওই মহিলা সত্যিই নয়নতারা কিনা?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে থেকে বিন্দুবাসিনী বলেন, 'না, তেমন কেউ আমার চোখে পড়ে নি। অবশ্য ওদের গেটটা উলটো দিকে। আমাদের এখান থেকে ভাল দেখা যায় না।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় তাঁর, সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'আরে, তোমাদের তো মহিলার বাড়িটাই দেখানো হয়নি। চল—'

বিন্দুবাসিনীদের দোতলার ব্যালকনিটা আধখানা বৃত্তের মতো দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিমে ঘুরে গেছে। বিন্দুবাসিনী হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হুইল চেয়ারটা পশ্চিম দিকে নিয়ে আসেন। তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রণিতারাও চলে আসে।

ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিন্দুবাসিনী বলেন, 'ওই যে বাড়িটা—'

রণিতারা লক্ষ করল, বাড়িটা দোতলা। ইওরোপে গ্রীষ্মকালীন অবসর কাটানোর জন্য যে ধরনের ভিলা দেখা যায়, অনেকটা সেইরকম। এ অঞ্চলের অন্য সব বাড়ির মতো ওই বাড়িটা ঘিরেও বিশাল বাগান। বাগানের এধারে প্রায় পনেরো ফুট উঁচু মজবুত কমপাউন্ড ওয়াল। তার ওপর আবার পাঁচ লাইন করে কাঁটাতার বসানো। পাঁচিল টপকে চট করে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব।

বাগানের গাছপালা এত ঘন যে বাড়ির ভেতরটা বিশেষ দেখা যায় না। বিন্দুবাসিনীদের মতো ওই বাড়িটারও দোতলার অর্ধেক জুড়ে টানা ব্যালকনি। সেটা এখন ফাঁকা। লোহার পাল্লার সামান্য একটু অংশ ছাড়া গেটটা প্রায় চোখেই পড়ে না, বাড়ির আড়ালে সেটা ঢাকা পড়ে গেছে।

রণিতার কেমন সংশয় হয়, যত উদ্দীপনাই থাক, বিন্দুবাসিনীর মতো একজন বৃদ্ধার পক্ষে পঁচাত্তর বছরের জ্যোতিহীন চোখ দিয়ে গাছগাছালির বাধা পেরিয়ে পাঁচ শ' ফুট দূরের এক মহিলাকে নয়নতারা বলে শনাক্ত করা সম্ভব কিনা। মনে মনে কিছুটা হতাশা বোধ করে সে।

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'আমার একটা পরামর্শ আছে।'

'বলুন—' রণিতা উৎসুক চোখে তাকায়।

ভদ্রমহিলা বোধহয় থট-রিডার, মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারেন। বললেন, 'প্রথমে তোমরা নিশ্চিত হয়ে নাও, মহিলাটি সত্যিই নয়নতারা কিনা।'

'কীভাবে?'

'সে জন্যে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। তোমাদের যুবা বয়সের চোখ, যথেষ্ট তেজ আছে। এখানে বসে বসে ওই বাড়িটার ওপর নজর রাখো। দরকার হলে বাইনোকুলারটা ব্যবহার করো। যদি তোমাদের মনে হয় মহিলা নয়নতারাই তখন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অবশ্য—'

'কী?'

'শুনেছি ও বাড়িতে নিজেদের ঘনিষ্ঠ লোকজন ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তোমরা ভেতরে যাবার সুযোগ পাবে কি? অবশ্য সেটা পরের কথা। আগে নয়নতারা সম্পর্কে সব সংশয় দূর করে নিতে হবে।'

'সে তো ঠিকই। কিন্তু—'

'কী?'

একটু ভেবে রণিতা বলে, 'আপনি বলেছেন চার মাসে মাত্র তিনবার ওঁকে দেখেছেন। আমাদের কত দিন ওঁদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে?'

এ দিকটা আগে বোধহয় চিন্তা করেন নি বিন্দুবাসিনী। ভুরু সামান্য কুঁচকে বলেন, 'এটা একটা সমস্যা বটে। কিন্তু কী আর করা, যতদিন না ওঁকে দেখতে পাচ্ছ তাকিয়ে থাকতেই হবে।'

'সেটা করতে হলে আপনার বাড়িতে তো রোজই আসতে হয়।'

'তা তো হয়ই। একটা বড় কাজ করতে চাইছ, তার জন্যে এটুকু পরিশ্রম করবে না? রোজ সকালে এখানে চলে আসবে। সন্ধে পর্যন্ত ওই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকবে। লাঞ্চ, ব্রেক ফাস্ট, সব এখানে করবে। যখন যা সাহায্য দরকার, আমি করব।'

রণিতারা বুঝতে পারছিল, এই বয়সে, পানসে কর্মহীন জীবন আর ভাল লাগছে না বিন্দুবাসিনীর। তাদের দেখে রীতিমত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। নয়নতারাকে খুঁজে বার করার মতো দারুণ রোমাঞ্চকর এবং রহস্যময় এক অভিযানে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতে চান।

অমিতেশ মজার গলায় বলে, 'বার্ড ওয়াচারদের মতো তাকিয়ে থাকার কথা বলছেন?'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

রণিতা বলে, 'ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের ব্যাপারে ভাববেন না। আমরা ব্যবস্থা করে নেব।'

বিন্দুবাসিনী রেগে যান, 'তা হলে তোমাদের আসার দরকার নেই।'

রণিতা হকচকিয়ে যায়, 'মানে—'

'সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি। কতকাল আমাদের বাড়িতে লোকজন আসে না। তোমরা আমার নাতি-নাতনির বয়সী। বলে কিনা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবে। আন্তরিকতার দাম নেই তোমাদের কাছে? এমন হৃদয়হীন ছেলেমেয়ে আমি কখনও দেখিনি।' ক্ষুব্ধ, অভিমানী মুখে বসে থাকেন বিন্দুবাসিনী।

হাতজোড় করে শশব্যস্তে রণিতা বলে, 'অন্যায় হয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন। আমরা এখানেই খাব।'

বিন্দুবাসিনী খুব সম্ভব বেশিক্ষণ রাগ বা অভিমান করে থাকতে পারেন না। হাসিমুখে বলেন, 'ঠিক আছে, ক্ষমা করা গেল। তোমরা এখানে বসে বসে ওই বাড়িটা দেখতে থাকো। আমি ওষুধ খেয়ে আসছি।' বলে হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলে যান।

এখানেও কয়েকটা খাটো গুজরাতি চেয়ার সাজানো রয়েছে। রণিতা আর অমিতেশ বসে পড়ে।

মিনিট পাঁচেক বাদে বিন্দুবাসিনী ফিরে আসেন। তাঁর কোলে বাইনোকুলারটা রয়েছে। এবার পালা করে করে তিনজনে দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে ওই বাড়িটা দেখতে থাকে। কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না। বাড়িটা এমনই নিঝুম যে মানুষজন আছে কিনা সন্দেহ।

দুপুরে দোতলারই আরেক মাথায় ডাইনিং রুমে রণিতাদের নিয়ে যান বিন্দুবাসিনী। সেখানে তাঁর দেওর সুধীরেশ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ হয়। বিন্দুবাসিনীর প্রায় সমবয়সী, ভারি চেহারার এই মানুষটির প্রায় গোটা মাথা জুড়ে টাক, এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত মাথার পেছন দিকটা ঘিরে ধবধবে সাদা কিছু চুল এখনও অবশ্য টিকে আছে। মোটা ভুরু, শান্ত চোখ, গোল মাংসল থুতনি। পরনে পাজামার ওপর ঢলঢলে ফতুয়া ধরনের পকেটওলা জামা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

ভদ্রলোক যে অত্যন্ত স্বল্পভাষী সেটা বোঝা গেল, যখন বিন্দুবাসিনী রণিতাদের এ বাড়িতে আসার কারণটা সাতকাহন করে জানালেও তিনি শুধু নিরাসক্তভাবে বললেন, 'ও।' তারপর প্লেটের ওপর ঝুঁকে অপরিসীম মনোযোগে খাওয়া শুরু করলেন।

তাঁর মুখে মাত্র এক অক্ষরের একটি শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় বুঝিবা বিব্রত বোধ করছিলেন বিন্দুবাসিনী। সুধীরেশের ব্যবহারে পাছে রণিতারা কিছু মনে করে তাই নিজেই দেওর সম্পর্কে প্রচুর কথা বলতে লাগলেন। সুধীরেশের স্বভাবটাই

ওরকম। ভীষণ চুপচাপ মানুষ। রিটায়ারমেন্টের পর সকালে ঘণ্টা দেড়েকের মর্নিং ওয়াক ছাড়া বাকি দিনটা বই নিয়েই তাঁর কেটে যায়। ওঁর অবশ্য পঞ্চাশ ষাটটা নানা জাতের পাখি আছে, তাদের নিয়েও খানিকটা সময় কাটে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন মাঝে মাঝে মুখ তুলে সামান্য হেসে, গলার ভেতর অস্পষ্ট আওয়াজ করে ফের খাওয়ায় মগ্ন হয়ে গেছেন সুধীরেশ। আওয়াজটা সন্তোষসূচক কিনা বোঝা যায়নি।

লাঞ্চের পর আবার রণিতারা তিনজন পশ্চিমের ব্যালকনিতে এসে বসেছে। কিন্তু চকিতের জন্য ও বাড়ির ঝুল বারান্দায় একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি।

পাঁচটা বাজলে চা খেয়ে রণিতারা আজকের মতো বিদায় নিতে যাবে, সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে যায়। এভাবে তো ব্যালকনিতে অনিশ্চিতভাবে বসে থেকে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো মহিলাকে একমাস কি দু' মাস পর দেখা গেল এবং নিঃসংশয় হওয়া গেল তিনি নয়নতারা নন। তখন এই এক দু' মাস পুরোপুরি নষ্ট। তাই অন্যভাবেও চেষ্টা করতে হবে।

তাই. রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, ও বাড়ির ফোন নাম্বার আপনি জানেন?'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'না!'

'বাড়ির নম্বরটা বলতে পারবেন?'

'তা পারব। চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিট। নম্বর জানতে চাইছ কেন?'

'দেখি যদি ঠিকানা থেকে ফোনের কোনো হদিশ পাওয়া যায়।'

'দেখো। কাল কখন আসছ?'

'ন'টায়।'

এগারো

রবিনসন স্ট্রিটের চোদ্দ নম্বর বাড়ির ফোন নাম্বারটা কিভাবে জানা যায়, ঠিক করতে পারছিল না রণিতা। একবার ভেবেছিল লালবাজারে রণজয়কে ফোন করে। পুলিশের বিপুল ক্ষমতা, ইচ্ছা করলে কয়েক মিনিটের ভেতর ওটা বার করে ফেলবে। পরক্ষণে তার মনে হয়েছে, না, পুলিশকে আপাতত জানাবে না। প্রথমে সে নিজের মতো করে চেষ্টা করবে। না পারলে তখন দেখা যাবে।

তার এক পিসতুতো দাদা অবনীশ ক্যালকাটা টেলিফোনের বিরাট অফিসার। আজ সকালে চা'টা খাবার পর তাকে ফোন করল রণিতা।

ওধার থেকে অবনীশের ঘুম-জড়ানো ভারি গলা ভেসে এল, 'কে?' তিনি বেশ লেট-লতিফ ধরনের মানুষ। অনেক রাত করে ঘুমোন, তাই উঠতে উঠতে দেরি হয়ে যায়।

রণিতা বলে 'আমি ছোট খুকি মণিদা—' ওরা ভাইবোনরা অবনীশকে মণিদা বলে ডাকে।

অবনীশের ঘুমের শেষ রেশটুকু মুহূর্তে ছুটে যায়। তিনি দারুণ মজার গলায় বলেন, 'মাউন্ট হিমালয়া কি আজ ইন্ডিয়ার উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে গেল নাকি?'

রণিতা বলে, 'মানে?'

'নইলে ছোট খুকি নিজের থেকে আমাদের ফোন করে? কী সৌভাগ্য! দাঁড়া দাঁড়া, তোর বৌদিকে ডাকি—'

রণিতা কিছু বলার আগেই ফোনে অবনীশের গলা ভেসে আসতে থাকে, 'শ্যামলী শুনছ, এদিকে এস, কুইক—' এরপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী কথা হয় সেটা আর বোঝা যায় না। একটু পর শ্যামলী বৌদির গলা শুনতে পায় রণিতা, 'বড় ডিরেক্টর হয়ে আমাদের কথা ভুলেই গেছ। কতদিন আমাদের এখানে ফোন কর নি, আস নি—বল তো?'

কথাটা ঠিকই বলেছে শ্যামলী। বছরখানেকের ভেতর ওদের বাড়ি যাওয়া তো বটেই, ফোনও করা হয় নি। বিব্রতভাবে রণিতা বলে, 'স্যরি বৌদি, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এবার থেকে দেখবে উইকে একবার করে তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

এরপর বাড়ির সবাই কে কেমন আছে, শ্যামলীর শাশুড়ি অর্থাৎ রণিতার আপন বড় পিসিমার বাতের কষ্টটা বেড়েছে কিনা, ওদের দুই ছেলে সানি আর বনির পড়াশোনা কেমন চলছে, ইত্যাদি নানা খবর নিয়ে রণিতা বলে, 'মণিদাকে আবার ফোনটা দাও—'

অবনীশ বলেন, 'হ্যাঁ, বল—'

রণিতা বলে, 'একটা ব্যাপারে আমাকে হেল্প করতে হবে মণিদা—'

'আই সি। য়ু আর টকিং শপ নাউ। ভেবেছিলাম আমাদের জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে তাই ছোট খুকি এই সাতসকালে ফোন করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে—'

'ইয়ার্কি কোরো না মণিদা—'

অবনীশ বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, বল কী করতে হবে?'

রণিতা বলে, 'আমি একটা বাড়ির ঠিকানা জানি কিন্তু ফোন নাম্বার জানি না। ফোন নাম্বারটা আমার ভীষণ দরকার। ঠিকানা বললে তোমরা কি ওটা বার করে দিতে পারবে?'

'কলকাতার ফোন তো?'

'তা না হলে তোমাকে বলব কেন?'

অবনীশ বলেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না। কবে চাই?'

রণিতা বলে, 'অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল—'

'আজ দুপুরে, ধর একটা নাগাদ আমার অফিসে একটা ফোন করতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

'দেখি তখন নাম্বারটা দিতে পারি কিনা। ঠিকানাটা বল।'

'লিখে নাও—'

ঠিকানা জানিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখে রণিতা। তারপর সোজা বাথরুমে চলে যায়। ন'টায় বিন্দুবাসিনীর কাছে পৌঁছুতে হবে। দিন তিনেক সে আর অমিতেশ ও বাড়িতে যাচ্ছে কিন্তু চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে বার দুই একটি কাজের মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি।

অবনীশের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর স্নান টান সেরে বেরিয়ে পড়ে রণিতা কিন্তু মেট্রো রেলের কালিঘাট স্টেশনের কাছে এসে অমিতেশের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তাকে। রোজ এখানে যে আগে আসে সে অন্যের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একসঙ্গে বিন্দুবাসিনীদের বাড়ি চলে যায়।

চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবার পর রণিতা যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে সেই সময় অমিতেশ এল। রণিতা মুখ খোলার আগেই সে বলে ওঠে, 'মায়ের সকাল থেকে শরীরটা খারাপ। ডাক্তারের কাছে গেলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।'

বিরক্তিটা মুহূর্তে কেটে যায়, চোখেমুখে উদ্বেগ ফুটে ওঠে রণিতার, 'হঠাৎ শরীর খারাপ হল?'

'হঠাৎ আর কোথায়? তুমি তো জানোই, মায়ের ইস্কিমিয়ার একটা ট্রাবল আছে। মাঝে মাঝে বুকের ব্যথাটা বেড়ে ওঠে। ক'দিন ওষুধ খেলে আর ডাক্তারের কথামতো চললে কমে যায়।'

'আজ না এলেই পারতে।'

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাই আসতে হল।'

'আমাকে একটা ফোন করলে না কেন?'

'করেছিলাম, তখন তুমি বেরিয়ে এসেছ।'

রণিতা বলে, 'ঠিক আছে, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি আজ একাই বিন্দুবাসিনী মাসিমার বাড়ি যাব।' বিন্দুবাসিনীকে তারা মাসিমা বলতে শুরু করেছে।

অমিতেশ বলে, 'একটা ইঞ্জেকসান দেবার পর মা এখন স্টেডি আছেন। কোনো ভয় নেই। তাছাড়া ছোট মাসিমাকে খবর দিয়ে আনিয়েছি, তিনিই মাকে দেখাশোনা করবেন। চল—'

বারো নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে এসে দেখা গেল বিন্দুবাসিনী পশ্চিমের ব্যালকনিতে চোখে দূরবীন লাগিয়ে বসে আছেন। অন্য দিন তিনি দক্ষিণ দিকে বসে থাকেন, রণিতারা এলে ব্রেকফাস্ট করে ওদের নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যান।

চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে বিন্দুবাসিনী বলেন, 'কী ব্যাপার, তোমরা তো ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি মেনে চল। আজ এত দেরি হল যে?'

কারণটা জানিয়ে দেয় অমিতেশ।

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'ও, আচ্ছা।' এখানেও কলিং বেলের ব্যবস্থা আছে। সুইচ টিপে তিনি তিনজনের ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নেন। কর্নফ্লেকসে দুধ ঢালতে ঢালতে বলেন, 'আজ ও বাড়িতে একটা লোককে দেখলাম। এতদিন কাজের মেয়ে, দারোয়ান আর বার কয়েক ওই মহিলাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখি নি। এই লোকটি নতুন।'

রণিতা উৎসকু সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কখন দেখেছেন?'

'ধরো ন'টা দশ টশে। তোমাদের জন্যে ন'টা পর্যন্ত ওধারে অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর এখানে এসে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়ির ও ধারের ব্যালকনিতে ভদ্রলোককে দেখলাম।' একটু থেমে বলেন, 'বেশ বয়েস হয়েছে, ছেষট্টি সাতষট্টির মতো। তবে স্বাস্থ্য খুব ভাল। এর বেশি এতদূর থেকে আর কিছু বোঝা যায় নি।'

'এই ভদ্রলোককে ধরতে পারলে মহিলা সম্পর্কে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে।'

'তা হয়তো পারে কিন্তু ওঁকে ধরবে কী করে?'

একটু ভেবে রণিতা বলে, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী?' বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসু চোখে তাকান।

'ভাবছি এখনই একটা চান্স নেব।'

'কিসের চান্স?'

'ওঁদের বাড়িতে ঢোকার। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তো হল। নইলে মহিলাটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা, একবার চেষ্টা করে দেখব।'

বিন্দুবাসিনী দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'দেখ। কিন্তু—'

তাঁর দ্বিধার কারণটা আন্দাজ করতে পারছিল রণিতা। এর আগেই বিন্দুবাসিনী জানিয়ে দিয়েছিলেন, চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে বাইরের লোকজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ, ওখানে গিয়ে সুবিধা হবে না। রণিতা বলে, 'ওরা ঢুকতে না দিলে কী আর করা যাবে। মিনিমাম এটুকু কনসোলেসান থাকবে যে আমরা চেষ্টা করেছিলাম।'

বিন্দুবাসিনী এবার আর বাধা দেন না। বলেন, 'দেখ তা হলে—'

রণিতা উঠে পড়ে। অমিতেশও উঠতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি একাই যাব। একটা মেয়েকে দেখলে ওরা দরজা খুলেও দিতে পারে কিন্তু দল বেঁধে গেলে সে আশা নেই। তুমি আর মাসিমা এখানে বসে বাড়িটা ওয়াচ করতে থাকো। আমি ঘুরে আসছি।'

রণিতার কথায় সায় দেন বিন্দুবাসিনী, 'সেই ভাল।'

রণিতা চলে যায়।

বারো

চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের গেটের পাল্লাটা আগাগোড়া দু' ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরি। খাড়াই বারো তেরো ফুট, চওড়ায় কম করে দশ ফুট তো হবেই।

বাড়ির সামনে ঝকঝকে রাস্তা, তার ওধারে ছোট একটা পার্ক। সেখানে প্রচুর গাছপালার ফাঁকে বাচ্চাদের জন্য দোলনা, নাগরদোলা, স্লিপ ইত্যাদি।

এখন দশটার মতো বাজে। কিন্তু রাস্তায় লোকজন অল্পই চোখে পড়ছে। তবে ঝাঁকে ঝাঁকে মারুতি, অ্যাম্বাসাডর কি কনটেসা বা বিদেশি ইমপোর্টেড কার প্রায় নিঃশব্দে মসৃণ গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে পদাতিক খুব কমই আছে, মাটিতে তারা কেউ পা ফেলতে চায় না।

নিরেট ইস্পাতের বিশাল গেটটার সামনে এসে প্রথমটা হতাশাই বোধ

করে রণিতা। এই জবরদস্ত ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা কি তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে!

গেটটা এত উঁচু যে রাস্তার দিক থেকে ভেতরের প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। দারোয়ান টারোয়ান কেউ আশেপাশে আছে কিনা কে জানে।

পিছিয়ে রাস্তার ওধারে পার্কের কাছে গিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল রণিতা। দূরে আসার জন্য গেটের মাথা টপকে দৃষ্টি ভেতর পর্যন্ত গেল বটে, তবে দোতলার খানিকটা অংশ আর বড় বড় গাছের ঝাঁকড়া ডালপালা ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

ফের রণিতা গেটের কাছে ফিরে এল। ইস্পাতের পাল্লায় যখন সে ধাক্কা মারতে যাবে, সেই সময় পাশের কমপাউন্ড ওয়ালে চোখ গেল তার। সেখানে দেওয়াল কেটে লেটার বক্স, আর তার গায়ে একটা কলিং বেল। রণিতা এক মুহূর্ত দেরি না করে বেল টিপল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই।

পর পর আরো কয়েক বার বেল বাজালো রণিতা। ভেতরে যে টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিন্তু গেট খোলার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই, এমন কি কারো গলা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ রণিতার মনে হল, বেল বাজালেও ইচ্ছা করেই খুব সম্ভব সাড়া দেওয়া হয় না। দর্শনপ্রার্থী তখন হয়তো ক্লান্ত হয়ে চলে যায় কিন্তু এ বাড়ির লোকেরা রণিতাকে চেনে না। সে যেমন একরোখা তেমনি জেদি, কিছু একটা মাথায় চাপলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না।

কাজেই অনবরত বেল বাজাতে লাগল রণিতা। দেখা যাক, কতক্ষণ ওরা সাড়া না দিয়ে পারে।

মিনিট দশেক পর ঘটাং করে ধাতব শব্দ হল। দেখা গেল ইস্পাতের গেটটার গায়ে ছোট একটা পাল্লা খুলে গেছে আর সেই ফোকরে দেখা দিয়েছে একটি মোঙ্গলিয় মুখ। লোকটা নেপালি ভূটানি বা সিকিমি হতে পারে। আধবোজা ছোট ছোট চেরা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিসকো চাহিয়ে?'

রণিতা বলে, 'গেটটা তো আগে খোল।'

'হুকুম নেহি হ্যায়।' ভাবলেশহীন গলায় জানিয়ে দেয় দারোয়ান।

একটু চিন্তা করে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে কে আছে?'

'কোঈ নেহি।'

বোঝা যাচ্ছে, 'বাড়িতে কেউ নেই,' 'গেট খোলা বারণ'— এ সব দারোয়ানকে শেখানো আছে। রণিতা বলে, 'কিন্তু একটু আগে তোমাদের দোতলায়

একজনকে যে দেখলাম—' মিথ্যেটা উচ্চারণ করতে তার গলার স্বর মুহূর্তের জন্যও কাঁপে না। লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

দারোয়ান পলকের জন্য থতিয়ে যায়। তারপর বলে, 'আপ ভুল দেকা মেমসাব—'

রণিতা বুঝতে পারে, বাড়ির ভেতর কেউ থাকলে দারোয়ান কিছুতেই কবুল করবে না। এ নিয়ে আর টানাহ্যাঁচড়া করে লাভ নেই। সে জিজ্ঞেস করে, 'সকালে তোমাদের বাড়িতে তো এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনিও কি নেই?'

দারোয়ান চমকে ওঠে। তার চোখেমুখে চকিতের জন্য দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে। মিলিয়ে যায়। দ্রুত শ্বাস টেনে সে বলে, 'নেহি, কোঈ নেহি আয়া হ্যায়।'

লোকটা ভালমানুষের মতো মুখ করে ডাহা মিথ্যে বলছে। যে প্রতিজ্ঞা করেছে সত্যি বলবে না তার পেট থেকে আসল কথাটা বার করা মুশকিল। রণিতা এবার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, 'তোমাদের এই বাড়ির মালিক কে?'

এমন একটা প্রশ্ন বোধহয় আশা করে নি দারোয়ানটা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বলে, 'মালিক নেহি, মালকিন। মেরা মেমসাব—'

'নাম কী তোমার মেমসাহেবের?'

'মালুম নেহি—'

'কখন ফিরবেন?'

'মালুম নেহি—'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কখন এলে মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

দারোয়ান বলে, 'মালুম নেহি।'

'যদি সকালে আসি, উনি থাকবেন?'

'মালুম নেহি।'

দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়—রণিতা যখনকার কথাই বলে সেই একই উত্তর। লোকটাব ভেতর 'মালুম নেহি'র একটা ক্যাসেট পুরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেন চালু করে রাখা হয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করলেই ওটা শোনা যাবে।

রণিতা ভেতরে ভেতরে খেপে যাচ্ছিল, তবে মনোভাবটা বাইরে ফুটে বেরুতে দেয় না। এমন তো নয় যে সে আর আসবে না। বার বার এসে দারোয়ানটাকে তোয়াজ করলে হয়তো একদিন না একদিন এ বাড়ির গেট খুলে যাবে। কিন্তু প্রথম দিনই চটিয়ে দিলে সে আশা আর নেই।

রণিতা বলে, 'তার মানে যখনই আসি না কেন, তোমার মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না, এই তো?'

যত নরম করেই বলার চেষ্টা করুক না, রণিতার গলা থেকে খানিকটা ঝাঁঝ বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেটা গায়ে মাখে না দারোয়ানটা, নিরাসক্ত মুখে বলে, 'জি—'

রণিতা বলে, 'তোমাকে বুঝি এসব বলার জন্যে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

দারোয়ান কিছু বলে না, শুধু আধবোজা ঘুমন্ত চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে তাকিয়ে থাকে।

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের বাড়িতে লোকজন আসে?'

দারোয়ান চুপ।

রণিতা এবার বলে, 'তাদেরও নিশ্চয়ই বলে দাও মেমসাহেব বাড়ি নেই।'

দারোয়ান জবাব দেয় না।

রণিতা বলে, 'তোমার মেমসাহেব যখন ফিরবেন একটা খবর দিতে পারবে?'

দারোয়ানের ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক হয়, 'জি—'

'বলবে, খুব শিগগিরই আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই বাড়ির সামনে বসে থাকব। দেখব তোমার মেমসাহেব কখন বেরোন আর কখন ফিরে আসেন।'

রণিতার কথা শেষ হতে না হতেই ঝড়াং করে গেটের গায়ের ছোট চৌকো পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যায়।

বিন্দুবাসিনী আর অমিতেশ পশ্চিমের ব্যালকনিতে উদ্‌গ্রীব বসে ছিল। রণিতা ফিরে আসতেই দু'জন জানতে চাইল, 'কাজ কিছু হল?'

দারোয়ানের সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছে, তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে রণিতা বলে, 'ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তবে আমিও আল্টিমেটাম দিয়ে এসেছি।'

'কিসের আল্টিমেটাম?'

'দু-চারদিনের মধ্যে ওদের বাড়ির সামনে দিনরাত পিকেটিং শুরু করব।'

বিন্দুবাসিনী আর অমিতেশ হেসে ফেলে।

অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল। সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে। এধারে ওধারে ছন্নছাড়া ভবঘুরে কিছু মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। চারপাশের গাছগাছালির মাথায় পাখি উড়ছিল। কোথায় ডালপালার আড়ালে বসে ঘুঘু ডাকছে একনাগাড়ে।

বিন্দুবাসিনী বললেন, 'চল, দুপুরের খাওয়াটা সেরে আসি।'

লাঞ্চের পর আবার তিনজনে পশ্চিমের ব্যালকনিতে ফিরে আসে। আর

তখনই অবনীশের কথা মনে পড়ে যায় রণিতার। আজ দুপুরে তিনি ওকে ফোন করতে বলেছিলেন।

রণিতা বলে, 'আমি একটা ফোন করব মাসিমা।'

'নিশ্চয়ই করবে। টেলিফোনটা আনিয়ে দিচ্ছি।'

বিন্দুবাসিনী বেল বাজিয়ে কাজের লোককে ডাকতে যাবেন, রণিতা বলে, 'আমিই নিয়ে আসছি।'

দক্ষিণ দিকে যেখানে সারাটা দিন বিন্দুবাসিনী বসে বসে কাটিয়ে দেন সেখানে একটা টেবলের ওপর টেলিফোনটা থাকে। ফোন আর বাইনোকুলার এই দুটো দিয়েই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যেটুকু যোগাযোগ।

ফোনটা নিয়ে আসে রণিতা। দোতলার এই ব্যালকনিতে নানা জায়গায় প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে। সেখানে প্লাগ লাগিয়ে একবার ডায়াল করেই অবনীশকে ধরে ফেলে সে।

অবনীশ বলেন, 'নাম্বারটা পেয়ে গেছি রে ছোট খুকি। ওটা প্রাইভেট নাম্বার, টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে ছাপা হয় না। টুকে নে—'

অমিতেশের পকেটে সব সময় একটা ছোট নোট-বই আর ডট পেন থাকে। রণিতা অবনীশের কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা জেনে নিয়ে অমিতেশকে বলে, 'লেখো—'

অমিতেশ লিখে নেয়।

রণিতা এবার অবনীশকে বলে, 'কার নামে এই ফোনটা নেওয়া হয়েছে জানো?'

অবনীশ বলেন, 'নিশ্চয়ই। মমতা রায় নামে এক ভদ্রমহিলার নামে।'

রণিতা বেশ দমে যায়, 'ঠিক দেখেছ? অন্য কারো নামে নেই তো?' সে নিশ্চিত ছিল নয়নতারা রায়ের নামটা শুনতে পাবে, ফলে রীতিমতো হতাশই হতে হয়।

অবনীশ বলেন, 'আরে বাবা, অত ভুল আমার হয় না, তিন চার বার আমি রেকর্ডটা খুঁটিয়ে দেখেছি।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'তা হ্যাঁ রে, তুই কি অন্য কারো নাম এক্সপেক্ট করেছিলি?'

নয়নতারার নামটা মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, মুহূর্তে সামলে নেয় রণিতা। আপাতত ব্যাপারটা জানাজানি হোক, সেটা চায় না সে। দ্রুত বলে ওঠে, 'না না, ঠিক আছে। তুমি আমার জন্যে এত করলে। মেনি মেনি থ্যাংকস।'

'শুকনো থ্যাংকসে চিড়ে ভিজবে না, একদিন তোর বৌদি আর আমাকে ভাল রেস্তোরাঁয় ফার্স্ট ক্লাস একখানা লাঞ্চ খাওয়াতে হবে।'

'নিশ্চয়ই খাওয়াব। কবে তোমাদের সময় হবে আগে জানিও। এখন ছাড়ছি মণিদা—'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ব্যস্তভাবে অবনীশ বলে ওঠেন, 'আরে আসল কথাটাই সকালে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

রণিতা বলে, 'কী কথা?'

'চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের ফোন নাম্বারটার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিস কেন?'

'পরে শুনো।'

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মিস্টিরিয়াস।'

'এখন কিছু জানতে চেও না মণিদা—' অবনীশকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখে রণিতা।

বিন্দুবাসিনী আর অমিতেশ অসীম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

রণিতা বলে, 'আমার এক পিসতুতো দাদার সঙ্গে। ও ক্যালকাটা টেলিফোনসের বিরাট অফিসার।'

'কার ফোন নাম্বার নিলে?' বিন্দুবাসিনী জানতে চাইলেন।

মজাদার একটু হেসে রণিতা বলে, 'মমতা রায়ের।'

'সে কে?'

'চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে যিনি থাকেন।'

বিমূঢ়ের মতো বিন্দুবাসিনী বলেন, 'কিন্তু—'

রণিতা বলে, 'ও বাড়িতে নয়নতারা থাকেন, এটাই বলবেন তো?'

আস্তে মাথা নাড়েন বিন্দুবাসিনী।

রণিতা বলে, 'কিন্তু ফোনটা রয়েছে মমতা রায়ের নামে।'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'যে নামেই থাক, আমি কিন্তু মহিলাকে দেখে তাঁর সঙ্গে কথা না বলে ছাড়ছি না।'

•

বিন্দুবাসিনী আর রণিতা যখন কথা বলছিল, সেই সময় অমিতেশ চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে চোদ্দ নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে উত্তেজিত

গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'দারোয়ানটা তোমাকে স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে। ওই যে, ও বাড়ির ব্যালকনিতে একজন মিডল-এজেড ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে—'

'কোথায় কোথায়—' অমিতেশের হাত থেকে বাইনোকুলারটা একরকম কেড়ে নিয়ে নিজের চোখে লাগায় রণিতা। বলে, 'রাইট, রাইট। এই তো। না না অমিত, মিডল-এজেড নয়, হি মাস্ট বি অ্যারাউন্ড সেভেনটি। সাদা চুল, সাদা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, সাদা হুইস্কার—এই যাঃ, ডান পাশের ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছেন।'

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'এখন তা হলে কী করবে? ফের ও বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?'

রণিতা বলে, 'লাভ কিছু হবে না। দারোয়ানটা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর আছেন। আর আমি যতক্ষণ গেটের কাছে থাকব উনি বেরুবেন না। পিকেটিংয়ের ভয় দেখিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু সারাদিন থাকলেও সত্যি সত্যিই তো আর রাত্তিরে রাস্তায় বসে থাকা যাবে না।' একটু ভেবে বলে, 'একটা কাজ অবশ্য করা যায়।'

'কী?'

'একবার ও বাড়িতে ফোন করে দেখি—'

অমিতেশ বলে, 'গুড আইডিয়া। আগেই করা উচিত ছিল—'

রণিতা ডায়াল করে চোদ্দ নম্বরের লাইন ধরে ফেলে। 'হ্যালো' বলতেই ওদার থেকে একটি মহিলা আকাট পূর্ববঙ্গীয় সুরে বলে ওঠে, 'কারে চাইতে আছেন দিদিমণি?'

গলাটা শুনে মনে হল বাড়ির কাজের লোক। রণিতা বলে, 'তোমার মেমসাহেবের সঙ্গে—'

'ম্যামসাহেব বাড়িত্ নাই।'

'আছেন। ভাল করে দেখে এসে বল—'

'নাই। বিশ্বাস করেন দিদিমণি। মা কালীর কিরা (দিব্যি)।'

'ঠিক আছে, আমি আবার ফোন করব।'

'পরাণে য্যাত বার চায় ত্যাত বার কইরেন। অখন ফুন (ফোন) রাখি। পন্নাম (প্রণাম)।'

নাঃ, কোনোভাবেই চোদ্দ নম্বর বাড়ির স্বত্বাধিকারিণীকে ধরা যাচ্ছে না। দারোয়ান থেকে কাজের মেয়ে পর্যন্ত সবাইকে শেখানো আছে, অচেনা কেউ ফোন করলেই তারা তোতাপাখির মতো একই বুলি আউড়ে যাবে, 'মেমসাহেব বাড়ি

নেই।' এভাবে কিছুতেই নয়নতারার কাছে, যদি চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের মহিলাটি সত্যিই নয়নতারা হন, আদৌ পৌঁছনো যাবে না। তার জন্য অন্য পদ্ধতি ভেবে বার করতে হবে।

তেরো

নয়নতারাকে নিয়ে ডকু-ফিচারের পরিকল্পনা যেদিন নেওয়া হয় সেই শুরু থেকেই ইন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসুক হয়ে আছেন। রোজ রাতেই খাবার টেবলে বসে খোঁজ নেন, রণিতার কাজ কতদূর এগুলো কিংবা মায়াকাননের অলীক পরীর মতো তাঁর যৌবনকালের সুপারস্টারটির সঙ্গে যোগাযোগ করা আদৌ সম্ভব হয়েছে কিনা।

রণিতাও বিন্দুবাসিনীদের পশ্চিমের ব্যালকনিতে বসে সারাদিন কী করল, বাবাকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিররণ দিয়ে যায়। টেবলের অন্য প্রান্তে সারা মুখে পৃথিবীর সবটুকু গাম্ভীর্য মাখিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে যান সুধাময়ী। নয়নতারা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

ইন্দ্রনাথ প্রায়ই বলেন, 'আমার কী মনে হয় জানিস ছোট খুকি—'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'নয়নতারা ওই চোদ্দ নম্বর বাড়িতেই আছে। ওখানে নজর রেখে যা।'

'তা তো রাখছিই কিন্তু একদিনও মহিলাটিকে দেখতে পাই নি। বিন্দুবাসিনী মাসিমাদের বাড়ির দিকে ওঁদের যে ব্যালকনি সেখানে একবারও উনি আসেন না। আমরা যে ওয়াচ করছি সেটা বোধ হয় উনি টের পেয়ে গেছেন।'

'তা হলে কী করা?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তোকে নজর রাখতে বলেছি ঠিকই কিন্তু অনন্ত কাল তো এভাবে তাকিয়ে থাকা যায় না। ডেসপারেট কিছু করা দরকার।'

মনে মনে একটা দুঃসাহসী বেপরোয়া সিদ্ধান্তের কথা আবছাভাবে চিন্তা করেছে রণিতা কিন্তু সেটা তার কাছে এখনও খুব পরিষ্কার নয়। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে বল?'

'এখনও ভেবে উঠতে পারি নি। কিছু মাথায় এলে তোকে বলব।'

মণিময় চ্যাটার্জি, রমেন লাহা, রণজয়, এমনকি ফোটোগ্রাফার কেষ্টপদও মাঝে মাঝে জানতে চেয়েছেন কতদূর কী হল। রণিতা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, বলার মতো তেমন কিছু হয় নি। হওয়া মাত্র খবর দেওয়া হবে।

এর মধ্যে বক্স নাম্বারে একটা বেনামা চিঠি এল।

মহাশয় / মহাশয়া,

খবরের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞপ্তিটি গত এক মাসে দু' বার আমার চোখে পড়েছে। আপনারা একজন বিখ্যাত নটীকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তৈরি করতে যাচ্ছেন, এতে চিত্র ও মঞ্চপ্রেমিক হিসেবে আহ্লাদিত হবার কথা। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র আনন্দ বা আহ্লাদ হয়নি। আমি বিজ্ঞপ্তিটি উপেক্ষাই করতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম নিরাসক্ত থাকব।

পরে ভেবে দেখেছি চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। আমি আপনাদের কতটা তথ্য দিতে পারব জানি না। তবে এমন একটি খবর দিতে পারি যা কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

অভিনয়ে যত নামডাকই থাক, আসলে নয়নতারা ঘোর মায়াবিনী, তাকে ডাকিনীও বলতে পারেন। সে আমার সুখশান্তি, ঘর সংসার, সব ছারখার করে দিয়েছে।

আপনারা লক্ষ করেছেন কিনা জানি না। আট বছর আগে নয়নতারা যখন নিরুদ্দেশ হয়, সেই সময় নর্থ বেঙ্গলের একজন চা-বাগানের মালিক সমরেশ ভৌমিকও নিখোঁজ হয়ে যায়। কাগজে খুব ছোট করে এই খবরটি ছাপা হয়েছিল। এই সমরেশ ভৌমিক আমার স্বামী।

আমরা থাকতাম জলপাইগুড়িতে। ওখানকার এক সিনেমা হলে নয়নতারার প্রথম ফিল্মটি দেখার পর থেকেই সমরেশ তার ফ্যান হয়ে যায়। ক্রমশ তার অনুরাগটা মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে সে নয়নতারাকে চিঠি লিখত, তাড়া তাড়া চিঠি। সেগুলো শুধু উচ্ছ্বাস আর স্তুতিতে বোঝাই। তার ছবি দেখে সমরেশ যে কতটা আলোড়িত কতটা মুগ্ধ, পাতার পর পাতা জুড়ে তারই বর্ণনা।

প্রথম প্রথম নয়নতারা জবাব দিত না। কিন্তু চাটুবাদের অপার মহিমা। বছরখানেক পর নয়নতারার উত্তর আসতে লাগল। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলল বেশ কিছুদিন। তারপর নয়নতারা একদিন আমার স্বামীকে কলকাতায় যেতে লিখল, এমন একজন একনিষ্ঠ স্তাবকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে খুবই উৎসুক।

সমরেশ কলকাতায় ছুটল। সেই শুরু। তারপর স্ত্রী-ছেলেমেয়ে-সংসার-চা বাগান, সব মাথায় উঠল। কাজের ছুতো করে মাসের বেশির ভাগ কলকাতায় কাটাত সে।

প্রথম প্রথম আমি এ ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। সমরেশ নয়নতারার ফ্যান. মাঝে মাঝে সে তাকে চিঠি লেখে, এটুকুই শুধু জানা ছিল। তলায় তলায় নদী যে পাড় ভাঙার কাজটা গোপনে অনেক দূর এগিয়ে রেখেছে, সেটা জানা যায় নি। যখন জানতে পারলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর বিশেষ কিছু করার ছিল না। তবু স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তার মন সংসারের দিকে যাতে ফেরে তার জন্য কী না করেছি, কিন্তু বৃথাই। আফ্রিকায় এক ধরনের ভারি সুন্দর ফুল আছে, পোকা মাকড় পাখি প্রজাপতি যাই তার ওপর এসে বসুক না, সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে। আমার স্বামীর অবস্থা হল তাই। নয়নতারা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিল। কুহকিনীর মোহ কাটাবার শক্তি তার ছিল না।

এদিকে চা-বাগানের হাল খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজেরা দেখাশোনা না করলে যা হয়, কর্মচারীরা লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বাগানটা বিক্রিই করে দিতে হল।

তারপর একদিন নয়নতারার সঙ্গে যে আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হল সে কথা আগেই জানিয়েছি।

তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন। ব্রণ দেখলে মাছির ঝাঁক যেমন এসে ছেঁকে ধরে তেমনি চারপাশের লোকজন, এমন কি আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত চটচটে কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে ছুটে এল। তাদের মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি কিন্তু চোখে মিচকে চতুর হাসিটা গোপন রইল না। এতে তাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই, তবু তারা ভীষণ খুশি। মানুষের চরিত্রই বোধ হয় এই।

হাওয়ায় তখন এত কুৎসা উড়ছে, চারদিকে এত ফিসফাস আর গুঞ্জন যে মাসখানেক একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তারপরই অবশ্য মনকে শক্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। যে মানুষ স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করে না, সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালন করে না, তার সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নয়। অনেকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি কারো কথা না শুনে সোজা আদালতে চলে গেলাম এবং ছ'মাসের ভেতর একতরফা ডিভোর্সও পেলাম।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গেই একটা স্কুলে আমি অ্যাসিস্টান্ট হেড মিস্ট্রেস। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ছেলের এবার এম.এ ফাইনাল ইয়ার। গ্র্যাজুয়েট হবার পর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আসছে বছর আমার রিটায়ারমেন্ট।

আপনারা যে তথ্যচিত্রটিতে হাত দিয়েছেন তাতে তথ্যের ওপর নিশ্চয়ই

জোর দেবেন। দেখবেন, নয়নতারার জীবনী নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কোনো রকম ভাবালুতাকে যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। তার উজ্জ্বল দিকের পাশাপাশি এই নোংরা দিকটাও তুলে ধরবেন আশা করি। আমার একান্ত অনুরোধ সত্যের প্রতি আপনারা অবিচল থাকুন।

আপনারা নয়নতারার সন্ধান পেয়েছেন কিনা জানি না। তবে যদি আমার প্রাক্তন স্বামী সমরেশ ভৌমিককে খুঁজে বার করতে পারেন, নয়নতারার হদিস পেতে অসুবিধা হবে না। দু'জনের একসঙ্গে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

সমরেশের চেহারার একটু বর্ণনা এখানে দিচ্ছি। খুবই সুপুরুষ সে। নিরুদ্দেশ হবার আগে তার সব চুল পাকে নি, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি ছিল, ছিল চওড়া জুলপি আর শৌখিন গোঁফ। গায়ের রং ফর্সা, হাইট ছ'ফিটের মতো।'

স্বাক্ষরহীন চিঠিটি এখানেই শেষ।

বিন্দুবাসিনীর বাড়ি থেকে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে বক্স নাম্বারের চিঠির জন্য মাঝে মাঝেই 'দিনকাল' অফিসে চলে আসে রণিতা আর অমিতেশ। আজও এসেছিল।

লাইব্রেরিতে বসে দু'জনে বেনামা চিঠিটা বার তিনেক করে পড়ল। তারপর অমিতেশ বলে, 'দারুণ ইন্টারেস্টিং লেটার। নয়নতারাকে ঘিরে কত টাইপের যে মানুষ জমা হয়েছিল, ভাবা যায় না।'

রণিতা বলে, 'আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'বিন্দুবাসিনী মাসিমা যে ভদ্রলোককে চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের ব্যালকনিতে দেখেছিলেন, আমরাও তাঁকে এক ঝলক সেদিন দেখেছি। তাঁর চেহারাটা মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, পড়ছে—'

'ভাল করে ভেবে বল।'

কিছুক্ষণ চোখ দুটো আধবোজা করে থাকে অমিতেশ। তারপর বলে, 'বয়েস হলেও বেশ হ্যাণ্ডসাম।'

রণিতা বলে, 'ওরকম সাদামাটা ডেসক্রিপশানে হবে না, ডিটেলে বল।'

অমিতেশ চোখ দুটো আগের মতো অর্ধেক বুজে রেখেই বলে, 'লম্বায় অ্যাবাউট সিক্স ফিট, কমপ্লেকসান ফেয়ার—'

'গুড। বলে যাও—'

'সাদা চুল, লম্বাটে মুখ, চওড়া হুইস্কার, ফ্রেঞ্চকাটি দাড়ি—'

'ফাইন।'

'দাড়ি, জুলপি চুলের মতোই ধবধবে।'

'গ্রেট। এবার চিঠিতে যে সমরেশ ভৌমিকের ডেসক্রিপশান আছে তাঁর সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের সিমিলারিটি আছে কিনা, মনে মনে মিলিয়ে নাও।'

প্রায় লাফিয়ে ওঠে অমিতেশ, 'একজাক্টলি। ওই ভদ্রলোকই সমরেশ ভৌমিক। এ ব্যাপারে আমার কোনোরকম সন্দেহ নেই।'

রণিতা বলে, 'নেই তো?'

'নো, নো। নট অ্যাট অল।'

'তা হলে আমরা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছি বল। এই ভদ্রলোক সমরেশ ভৌমিক হলে দ্যাট লেডি মাস্ট বি নয়নতারা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'এবার কী করতে চাও?'

রণিতা বলে, 'চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে যেভাবেই হোক ঢুকে পড়তে হবে।'

'সেটা তো আগেও বলেছিলে। কিন্তু কোন কৌশলে? মোডাস অপারেন্ডিটা কী?'

'সেটা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। আজ সারারাত চিন্তা করে কিছু একটা বার করতে হবে। তুমিও ভেবো। কাল বিন্দুবাসিনী মাসিমার বাড়িতে এই নিয়ে আলোচনার পর কাজে নেমে পড়ব। ওকে?'

'ওকে মেমসাহেব।'

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় বিন্দুবাসিনীদের বাড়ির পশ্চিমের ব্যালকনিতে হাজির হয়ে যায় অমিতেশ আর রণিতা। বিন্দুবাসিনী তাদের জন্য অন্য দিনের মতোই অপেক্ষা করছিলেন। কালকের সেই চিঠিটা রণিতা তাঁকে দিতে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন, উত্তেজনায় তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। বললেন, 'বয়েস হলেও মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় নি।'

চোদ্দ নম্বর বাড়ির মহিলাটি যে নয়নতারা, সে সম্পর্কে কারো আর সংশয় নেই।

রণিতা বলে, 'কাল সারারাত ভেবে আমি ঠিক করেছি, ও বাড়িতে ঢুকে পড়ব। নইলে কাজ কিছুতেই এগুচ্ছে না।'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'ঢুকবে কী করে? ওদের দারোয়ান ভেতরে একটা মাছিও গলতে দেয় না।'

রণিতা বলে, 'সে কথা আমার ভালই জানা আছে।'

'তা হলে?'

বারো আর চোদ্দ নম্বর বাড়ির মাঝখানে বাউন্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে বিন্দুবাসিনীদের একটা ডালপালাওলা প্রকাণ্ড কালোজামের গাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কয়েকটা ডাল পাঁচিলের ওধারে চলে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রণিতা বলে, 'ওই যে—'

বুঝতে না পেরে বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'মানে?'

'ওই গাছটা সমস্যার সমাধান করে দেবে।' বলে চোখ কুঁচকে হাসতে থাকে রণিতা।

বিন্দুবাসিনী কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে অমিতেশ, 'তুমি ওই গাছ বেয়ে ওপারে যেতে চাও নাকি?'

'একজাক্টলি।' আস্তে আস্তে মাথা দোলায় রণিতা।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!' উদ্বিগ্ন মুখে অমিতেশ বলে, 'অত উঁচু থেকে পড়লে হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'না না, এভাবে রিস্ক নেওয়াটা উচিত হবে না।'

রণিতা বলে, 'মাসিমা, আপনি জানেন না কিন্তু অমিত তো জানে, গ্র্যাজুয়েশনের পর আমি কয়েক মাস মাউন্টেনিয়ারিংয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আমার কাছে নাইলনের মোটা দড়ি আর হুক আছে। গাছের ডালে আটকে উঠে পড়তে পারব। ওধারে নামতেও অসুবিধে হবে না। চিন্তার কিছু নেই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অমিতেশ বলে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'নো।' জোরে মাথা নাড়ে রণিতা, 'আমি একলাই যাব।'

চিন্তিতভাবে অমিতেশ বলে, 'কিন্তু—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রণিতা বলে, 'আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা পুরোপুরি ট্রেসপাসিং—অনধিকার প্রবেশ। ওরা পুলিশ ডাকলে মেয়ে বলে আমি পার পেয়েও যেতে পারি কিন্তু তুমি বিপদে পড়বে।' একটু থেমে ফের বলে, 'ভেতরে গিয়ে আমি আগে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি। যদি দেখি সব কিছু ফেভারেবল তখন তোমাকে যেতে বলব।'

প্রথমে অমিতেশরা রাজি হয় না। অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত অবশ্য রণিতার কথাটা মেনে নেয়।

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'কবে ও বাড়িতে যেতে চাও?'

রণিতা বলে, 'আজই।'

'কখন যাবে?'

'দিনের বেলা কিছুতেই নয়। দেখে ফেললে এমন হইচই বাধিয়ে দেবে যে আমাদের সমস্ত প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে। ঢুকব কাল ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে, কেউ জেগে ওঠার আগে। মাঝরাতে ও বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও ঢুকতে পারি, তাতে বাকি রাতটা মশার কামড় খেয়ে কাটাতে হবে।'

পরিকল্পনাটা পছন্দ হয় বিন্দুবাসিনীর। বলেন, 'সেই ভাল।'

অমিতেশ কিছু ভাবছিল। বলে, 'কিন্তু একটা প্রবলেম থেকে যাচ্ছে। অত ভোরে তুমি এখানে আসবে কী করে?'

রণিতা বলে, 'সেটাও ভেবে রেখেছি। বিন্দুবাসিনী মাসিমা আজকের রাতটা এখানে যদি থাকতে দেন, তা হলে আর সমস্যা থাকে না। ভোরবেলা বর্ডার ক্রস করে 'আসানিসে' ওপারে চলে যেতে পারব।' একটু রগড় করার জন্য গলার স্বরে ঢেউ খেলিয়ে হিন্দি শব্দটা উচ্চারণ করল সে।

বিন্দুবাসিনী তক্ষুনি বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই থাকবে। আমি বলি কী আজ আর বাড়ি গিয়ে দরকার নেই। মা-বাবাকে ফোনে জানিয়ে দাও কাল ফিরবে।'

রণিতা বলে, 'না, বাড়িতে একবার যেতে হবে। দড়ি, হুক, টেপ রেকর্ডার, এগুলো আনা দরকার।'

'টেপ রেকর্ডার কেন?'

'যদি নয়নতারা কথা বলতে রাজি হন তার একটা রেকর্ড তো রাখতে হবে।'

'তবে একটা ক্যামেরাও নিয়ে যেও।'

'স্টিল ফোটো দিয়ে কাজ হবে না। নয়নতারা রাজি হলে পরে মুভি ক্যামেরা নিয়ে যাব।'

অমিতেশ বলে, 'এর মধ্যে আমার রোলটা কী?'

রণিতা বলে, 'আপাতত পর্যবেক্ষকের। তুমি শুধু দেখে যাবে, তারপর আমার সিগনাল পেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

রণিতা বিন্দুবাসিনীকে বলে, 'মাসিমা, অমিত আর আমি এখন যাচ্ছি। কয়েকটা কাজ আছে, সেগুলো সেরে সন্ধের পর আমি আসব। অমিত আসবে কাল সকালে। ও আর আপনি এই ব্যালকনিতে বসে ও বাড়িতে আমার অ্যাক্টিভিটি ওয়াচ করে যাবেন।'

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'আজ তা হলে ও বাড়ির ওপর নজর রাখা হবে না?'

রণিতা বলে, 'কী দরকার? কাল থেকেই তো অপারেশন শুরু হয়ে যাচ্ছে।'

চোদ্দ

এখনও ভোর হয়নি, গাছপালার মাথায় থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে, আলিপুরের এই এলাকাটা একেবারে নিঝুম। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই, সব ঘুমের আরকে ডুবে রয়েছে।

এই সময়ে রণিতা বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে সেই কালো জাম গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে ক্রাচে ভর দিয়ে এসেছেন বিন্দুবাসিনী। রণিতার হাতে লম্বা নাইলনের দড়ি, তার মাথায় আংটা লাগানো। পিঠে বাঁধা রয়েছে একটা মোটা পলিথিনের ব্যাগ, তার ভেতর ম্যাকিনটশ, নোটবুক, পেন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস।

বিন্দুবাসিনীর ডান হাতে ক্রাচসুদ্ধু একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। গাছের উঁচু দিকের একটা ডাল লক্ষ করে তিনি বোতাম টিপলেন। আলোকিত অংশটায় দড়ি ছুঁড়ে আংটা আটকে দিল রণিতা। তারপর দড়িটা ধরে গাছের গুঁড়িতে পায়ের চাপ দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ওপরে উঠে চাপা গলায় বলল, 'টর্চ নিভিয়ে আপনি বাড়ি চলে যান।'

বিন্দুবাসিনী বলেন, 'ওধারে নামতে পারবে তো?'

'পারব।'

'খুব সাবধান।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তুমি ওধারে না নামা পর্যন্ত আমি যাচ্ছি না। নেমেই কিন্তু জানিয়ে দেবে।'

মিনিট তিনেক বাদে পাঁচিলের ওধার থেকে রণিতার চাপা গলা শোনা যায়, 'মাসিমা নেমেছি।'

বিন্দুবাসিনী আর দাঁড়ান না, ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে বাড়িতে এসে সোজা পশ্চিমের ব্যালকনিতে গিয়ে তাঁর হুইল চেয়ারে বসেন।

রণিতা ওপারে নেমে এধারে ওধারে তাকিয়ে নেয়, কেউ কোথাও নেই।

চারদিকে অজস্র ফুলের গাছ, মাঝে মাঝে মসৃণ ঘাসের গালিচা। দূরে সামার ভিলার মতো নয়নতারাদের ছবির মতো দোতলা বাড়ি।

কেউ জেগে না থাকলেও বাড়িটার চারপাশে পুরনো আমলের গ্যাস লাইটের আদলে ক'টা ল্যাম্প পোস্টে আলো জ্বলছে। সতর্কতার কারণে সারারাতই ওগুলো জ্বলে।

রণিতা ব্যাগ থেকে ম্যাকিনটশ বার করে একটা গাছের পাশে পেতে তার ওপর বসে পড়ে। মুখ ফিরিয়ে বারো নম্বর বাড়িটার দিকে তাকায়। পশ্চিমের ব্যালকনিতে আবছা সিলুয়েট ছবির মতো দেখাচ্ছে বিন্দুবাসিনীকে। কয়েক পলক দেখেই এবার তার চোখ চলে যায় নয়নতারার বাড়িটার দিকে।

চারপাশে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে অজস্র জোনাকি জ্বলছে, নিভছে। কোনো অদৃশ্য পাতাল থেকে উঠে আসছে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ, আলিপুরের এই নিস্তব্ধ ভোরে ছড়িয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য বিষাদ। অনেকদিন পর জোনাকি দেখল রণিতা, ঝিঁঝির ডাক শুনল। কলকাতায় এই সব পতঙ্গরা যে এখনও টিকে আছে, এখানে না এলে জানা যেত না।

আকাশ যদিও ঝাপসা, তবু বোঝা যায় মেঘে ঢেকে আছে। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। কবজি উলটে একবার ইলেকট্রনিক ঘড়িটা দেখে নিল রণিতা, এখনও চারটে বাজেনি. দশ মিনিট বাকি। এই আগস্ট মাসটায় সাড়ে পাঁচটার আগে সকাল হয় না। এখনও দেড়টি ঘণ্টা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে বসে থাকতে হবে।

প্রচণ্ড সাহস আর জেদের বশেই এ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছে রণিতা। এরপর কোন কৌশলে নয়নতারার কাছে পৌছুবে কিংবা পৌঁছুনোর আগেই তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হবে কিনা সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। রণিতা মোটামুটি এটুকু বুঝতে পারছে, একটা বড় রকমের হার্ডল পেরুতে পেরেছে কিন্তু সামনে আরো কত উঁচু উঁচু বাধা মাথা তুলে রয়েছে, কে জানে। এ বড়িতে ঢোকার পর সে সব ভেবে আর লাভ নেই, যা হবার হবে, এমন একটা বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে সে দিনের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই রণিতার দু'চোখ জুড়ে আসে। বিন্দুবাসিনীদের বাড়িতে সে এসেছিল সাড়ে আটটা নাগাদ। পাঁচিল টপকানোর ছকটা আরো নিশ্ছিদ্র, আরো নিখুঁত করার জন্য আরেক দফা আলোচনাও করে নিয়েছে। তারপর দশটায় শুয়ে পড়েছিল কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে নি। ভোরে

কালোজাম গাছটা থেকে ওধারে নামার সময় ও বাড়ির কারো চোখে পড়ে যাবে কিনা, পড়লে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, এই টেনসানে তার স্নায়ু টান টান হয়ে ছিল। এমন মানসিক চাপ নিয়ে ঘুমনো যায় না। পাঁচিল ডিঙোবার পর এখন স্নায়ুগুলো আলগা হয়ে হয়ে শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি নেমে এসেছে।

হঠাৎ বৃষ্টি নামতে ঘুম ছুটে যায়। আকাশ থেকে সীসার ফলার মতো নেমে আসা বড় বড় জলের ফোঁটাগুলো তার সারা গা ভিজিয়ে দিয়েছে। ধড়মড় করে উঠে ম্যাকিনটশটা দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিজেকে মুড়ে ফেলে রণিতা।

বৃষ্টিটা যেমন আচমকা নেমেছিল তেমনি মিনিট দশ পনেরো বাদে হঠাৎই থেমে গেল। শরৎকালের বৃষ্টির চালটাই এরকম, কখন নামবে কখন থামবে আগে থেকে বলা মুশকিল।

যে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল, রণিতার চোখের পাতায় ফের সেটা ফিরে আসে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমের আরকে সে ডুবে যায়।

কতক্ষণ পর রণিতা জনে না একটা কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসে, 'মেমসাব, এ মেমসাব—' প্রথমে আবছা, তারপর ধীরে ধীরে ডাকটা স্পষ্ট হতে থাকে।

চোখ মেলেই চমকে ওঠে রণিতা, একটা মঙ্গোলিয়ান মুখ তার ওপর ঝুঁকে আছে। মুখটা তার চেনা কিন্তু আগে কোথায় দেখেছে, মনে পড়ল না। তেমনি ভেবে পেল না এই বাগানটার ভেতর সে এল কী করে!

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ভেতর ঘুমের রেশটা পুরোপুরি কেটে গেলে সব মনে পড়ে যায় রণিতার। মঙ্গোলিয়ান মুখটা দেখেছে এ বাড়ির গেটের একটা চৌকো ফোকরে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে সে ব্যাপারে কিছু করার আগেই দারোয়ানের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এমনিতে রণিতা খুবই সাহসী, কিছুটা বেপরোয়া ধরনের, কোনো বিপজ্জনক অবস্থাতেই সে বিহ্বল বা দিশেহারা হয়ে পড়ে না। মনের জোর তার অপরিসীম। কিন্তু এই মুহূর্তে রণিতার বুকের ভেতর অদ্ভুত এক শিহরন খেলে যায়। সেটা কি ভয়ে?

ভেতরে ভেতরে সে যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সেটা অবশ্য বাইরে বেরিয়ে আসতে দেয় না। রণিতা জানে তার এতটুকু দুর্বলতা দেখলে দারোয়ানটা গোলমাল শুরু করে দেবে। কোনোভাবেই মাথায় ওকে চড়তে দেওয়া যায় না। প্রবল ব্যক্তিত্বে তাকে দমিয়ে রাখতেই হবে।

ধীরে ধীরে গা থেকে ম্যাকিনটশটা খুলে ভাঁজ করে ব্যাগের ভেতর পুরতে থাকে রণিতা।

রোদ উঠে গিয়েছিল। গলানো গিনির মতো শরতের মায়াবী আলোয়

চারদিক ভেসে যাচ্ছে। কাল আকাশ জুড়ে যে ঘন কালো মেঘ ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই, জোরালো একগুঁয়ে হাওয়া ঠেলে ঠেলে তাদের দিগন্ত পার করে দিয়েছে। আকাশটা আজ পালিশ-করা আয়নার মতো ঝকঝকে।

দারোয়ান এবার ডাকে, 'এ মেমসাব—' এবার তার কণ্ঠস্বর রীতিমত রুক্ষ।

রণিতা গম্ভীর মুখে বলে, 'কী বলছ?'

'আপলোগ চুরায়া ইয়ে কোটিমে গুসা! চলিয়ে চলিয়ে—'

'কাঁহা।'

'কোটিকা বাহার—'

রণিতা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, কোনো বদ মতলব নিয়ে সে এখানে আসে নি, শুধু নয়নতারার সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাবে কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই দারোয়ানটার। এক নাগাড়ে কর্কশ গলায় বলে যায়, 'চলিয়ে চলিয়ে—' প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতেই রণিতাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেয় সে।

রণিতা যেমনই একরোখা তেমনি প্রচণ্ড তার ধৈর্য। একটা কিছু মাথায় চাপলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। কাজেই পরদিন রাতেও ফের কালো জামগাছের ডালে আংটা আটকে চোদ্দ নম্বর বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং পরদিন সকালে দারোয়ান আবার তাকে বাইরে বার করে দেয়।

পর পর চারদিন একই ব্যাপার ঘটে যায়। তবু হাল ছাড়ে না রণিতা। পঞ্চম দিন সকালে দারোয়ানের আচরণ পুরোপরি বদলে যায়। সে ডাকে, 'এ দিদিজি— দিদিজি—'

'মেমসাব' থেকে 'দিদিজি'। রণিতা বেশ অবাকই হয়। তার মনে হয়েছিল দারোয়ানটা অন্যদিনের মতোই তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। তা নয়, রীতিমত মোলায়েম সুরেই ডাকাডাকি করছে। এটা কোনো চতুর চাল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সতর্ক ভঙ্গিতে রণিতা বলে, 'কী বলছ?'

'আপ আইয়ে মেরা সাত (সাথ)।'

'কোথায়?'

দারোয়ান বলে, 'কোটিমে—' তার হিন্দি উচ্চারণটা বাচ্চাদের মতো আধো আধো, নেপালি বা ভুটিয়ারা যেভাবে বলে থাকে অবিকল সেই রকম।

শিরদাঁড়া পলকে টান টান হয়ে যায় রণিতার। কিসের একটা সংকেত সে পেয়েছে আবছাভাবে। দারোয়ানটিকে বাজিয়ে নেবার জন্য বলে, 'বাড়ির ভেতর যাবার কথা বলছ?'

'জি।'

'কিন্তু—'

'গাবড়াইয়ে মাত। মেমসাব নিয়ে যেতে বলেছেন—'

ফুসফুসের ভেতব দিয়ে চকিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়। দারোয়ানটা কার কথা বলছে, বুঝতে পেরেও রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কোন মেমসাহেব?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে দারোয়ান ভাবলেশহীন মুখে জানায়, রণিতা তার সঙ্গে গেলেই প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাবে।

রণিতা আর কিছু বলে না, ব্যাগটা কাঁধে ফেলে কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একবার পেছন ফিরে তাকায়। বারো নম্বর বাড়ির পশ্চিমের ব্যালকনিতে দেখা যাচ্ছে বিন্দুবাসিনীকে। ভোর রাতে চারটে থেকে আগের পাঁচদিনের মতোই ঐ একই জায়াগায় একই ভঙ্গিতে, পিঠ সোজা করে অনড় মূর্তির মতো নিচু দড়ির চেয়ারে বসে আছেন তিনি। আটাশ বছরের সতেজ দৃষ্টি দিয়েও এতদূর থেকে তাঁর মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে সেই মুখে যে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা মাখানো সেটা অনুমান করা যায়।

দারোয়ান আস্তে তাড়া লাগায়, 'চলিয়ে দিদিজি—'

'হ্যাঁ চল—' মুখ ফিরিয়ে দারোয়ানের পাশাপাশি রণিতা হাঁটতে শুরু করে। সে বুঝতে পারছিল নয়নতারা তাকে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোতে দেখে দারোয়ানকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন কিংবা দারোয়ানটাই তাকে দেখে নয়নতারাকে আজ খবর দিয়ে থাকতে পারে। যিনি দীর্ঘ আট বছর আত্মগোপন করে আছেন, কোনোভাবেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান না, তাঁর পক্ষে এভাবে ডাকিয়ে নিয়ে যাওয়াটা প্রায় অভাবনীয়। দারোয়ানের ঘাড় ধাক্কা খাওয়াটা এই ক'দিনে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বাড়ির ভেতর ডাক পড়ায় দস্তুরমতো অবাকই হয় রণিতা। নয়নতারার উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনি কি স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন?

বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে রণিতা টের পায়, হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন দ্রুততর হয়ে উঠেছে, তার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। কয়েক মিনিটের ভেতর ভারতীয় স্টেজ এবং স্ক্রিনের এক সুপারস্টারের সঙ্গে, যাঁকে বলা হয় লিভিং লিজেন্ড, দেখা হতে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে সারা দেশ জেনে যাবে নয়নতারাকে তাঁর রহস্যময় অজ্ঞাতবাস থেকে সে-ই বার করে এনেছে। তীব্র এক উত্তেজনা দ্রুত তার মধ্যে চারিয়ে যেতে থাকে।

বাগানের পর নুড়ির রাস্তা, তারপর চওড়া চওড়া আটটা স্টেপ ওপরে উঠে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড দরজার ভেতর দিয়ে দু'জনে একটা বড় হল-ঘরে

চলে আসে। হল-টা দামি লাল কার্পেট ঢাকা, তার একধারে নানা আকারের পেতলের সুদৃশ্য টবে অশ্বত্থ, মহুয়া, আম, কাঁঠাল, দেবদারু, ঝাউ ইত্যাদি নানা গাছের বনসাই। আরেক দিকে দেওয়ালের গা ঘেঁষে কোমরসমান হাইটের ক্যাবিনেটের ওপর ব্রোঞ্জ, কাঁসা, পেতল, লোহা ইত্যাদি নানা ধাতুর আশ্চর্য সব ভাস্কর্য। এগুলোর কোনোটা নটরাজ, কোনোটা ওড়িষার কোনো মন্দিরের যক্ষী, কোনোটা আফ্রিকার বান্টু উপজাতির নারীমূর্তি। মাঝখানে চার সেট সোফা।

হল-ঘরের এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, সিঁড়িগুলো আগাগোড়া জুটের ম্যাট দিয়ে মোড়া। দারোয়ান রণিতাকে সেদিকে নিয়ে গেল, বলল, 'উপর চলিয়ে—'

গুনে গুনে তিরিশটা সিঁড়ি পেরিয়ে রণিতা দারোয়ানের পিছু পিছু দোতলায় উঠে আসে। একতলার মতো অবিকল একই রকমের আরেকটা হল, পেতলের টবে তেমনই সব বনসাই, তবে দুটো দেওয়ালের গায়ে কাচের পাল্লা-দেওয়া বুক কেসগুলিতে অজস্র বই। এক দেওয়ালে চার্লি চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো আর সোফিয়া লোরেনের বড় ছবি। বোঝা যায়, এ বাড়ির স্বত্বাধিকারিণী ঐ তিন মহান শিল্পীর অনুরাগিণী। অন্য একটি দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট অয়েল পেন্টিং। হল-ঘরটাকে ঘিরে রয়েছে বেশ ক'টি বেড-রুম, সেগুলোর দরজায় পেস্তা রঙের পর্দা ঝুলছে।

দারোয়ান বলে, 'বৈঠিয়ে দিদিজি। মেমসাব আব্‌বি ইঁহা আ যায়েঙ্গি।'

সে আর দাঁড়ায় না, সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিচে নেমে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রণিতা। তারপর ব্যাগটা কাঁধ থেকে কার্পেটে নামিয়ে আস্তে আস্তে একটা সোফায় বসে পড়ে। তার মতো সাহসী, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মেয়ের কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

মিনিট দশেকও কাটল না, দক্ষিণ দিকের একটা বেড-রুমের পর্দা সরিয়ে হল-এ এসে দাঁড়ালেন নয়নতারা। প্রথমটা রণিতার মনে হল বিভ্রম, এই সকালবেলায় সে যেন অলীক কোনো স্বপ্ন দেখছে। মায়াকাননের যে পরী পঁয়ত্রিশটি বছর সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, তিনি এখন তার মাত্র দশ ফুট দূরে— ভাবা যায়!

কে বলবে ষাট পেরিয়েছেন নয়নতারা। সময়ের মেকআপ-ম্যান কপালের দিকের চুলে হালকা সাদা রং মাখিয়ে দেওয়া ছাড়া আর প্রায় কিছুই করে নি, লক্ষ করলে মুখের মসৃণ ত্বকে মিহি সুতোর মতো দু-চারটে সরু দাগ হয়তো খুঁজে বার করা যাবে। ব্যস, ঐ পর্যন্ত।

নয়নতারার পরনে এই মুহূর্তে গোলাপি সিল্কের শাড়ি এবং ঐ রঙেরই হাতায় সুতোর কাজ-করা জামা, পায়ে ফোমের হালকা স্লিপার।

সবে আশ্বিনের শুরু। গোটা হল-ঘরটায় দরজা-জানলা দিয়ে অজস্র মায়াবী আলো এসে পড়েছে। নয়নতারা আসায় সেই আলোর দ্যুতি যেন হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল রণিতা। নয়নতারা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। এই হাসিটির মধ্যে এমন এক পরমাশ্চর্য জাদু মেশানো যা তিনটি দশক ভারতীয় সিনেমা আর স্টেজকে রমণীয় লাবণ্যে ভরে দিয়েছে।

নয়নতারা সোফা দেখিয়ে বলেন, 'বসো।'

রণিতা যেন ঘোরের ভেতর থেকে উঠে এল। বলে, 'আপনি আগে বসুন—'

'ঠিক আছে।'

দু'জনে মুখোমুখি বসে।

নয়নতারা বলেন, 'তোমার নামটা জানলে কথা বলতে সুবিধে হবে।' পরক্ষণে কিছু মনে পড়তে সামান্য অপ্রস্তুত হলেন যেন, 'ঐ যাঃ, তোমাকে তুমি করে বলছি কিন্তু।'

রণিতা টের পাচ্ছিল তার বুকের ভেতর তীব্র নিখাদে কোনো অপার্থিব অর্কেস্ট্রা বেজে যাচ্ছে। সে ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'তুমি করে না বললে আমার অস্বস্তি হবে।' তারপর নিজের নাম বলে।

নয়নতারা বলেন, 'ফাইন। এবার বল তো তুমি চতুর না বুদ্ধিমতী?'

ভেতরে ভেতরে থমকে যায় রণিতা। নয়নতারার কথাটার একটা চাপা ইঙ্গিত আছে। সে সতর্কভাবে বলে, 'মানে—'

উত্তর না দিয়ে নয়নতারা বলেন, 'তার আগে এক কাজ কর, সোজা বাথরুমে চলে যাও। মুখটুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এস, তারপর কথা হবে। বাথরুমে নতুন পেস্ট, ব্রাশ, টাওয়েল, সব রয়েছে।' বলে ডান দিকের পর্দা-ঢাকা দরজা দেখিয়ে দেন।

রণিতা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়েই থাকে। তার যে সকালে টয়লেটে যাওয়া হয়নি, গাছে হেলান দিয়ে বাগানে রাতের শেষ দিকটা কেটেছে, নয়নতারা জানলেন কী করে? কিন্তু বসে থাকা সম্ভব হয় না, নয়নতারা তাকে তাড়া দিয়ে বাথরুমে পাঠিয়ে দেন।

প্রায় আড়াই'শ স্কোয়ার ফিটের বাথরুমটা ধবধবে বাথ-টাব, কমোড,

শাওয়ার, ওয়াল-মিরর ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো। একধারে সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে নতুন তোয়ালে, ব্রাশ পেস্টও রয়েছে।

ভোরের দিকের ঘণ্টা দেড়েক বাদ দিলে কাল সারা রাত গেল পাঁচদিনের মতো একেবারেই ঘুম হয়নি। নয়নতারাকে দেখার পর একটা ঘোরের মধ্যে ছিল রণিতা। এখন বোঝা যাচ্ছে, চোখ জ্বালা জ্বালা করছে, কপালের দু'ধারে শিরাগুলো সমানে লাফাচ্ছে। অনেকক্ষণ চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে দাঁত ব্রাশ ট্রাশ করে যখন সে বেরিয়ে এল নিজেকে বেশ টাটকা লাগছে। চোখের জ্বালা এবং কপালের দপদপানিটা আর নেই।

নয়নতারা একই জায়গায় বসে ছিলেন। হাসিমুখে বলেন, 'এস।'

রণিতা গিয়ে তার সোফাটায় বসতে না বসতেই একটি বয়স্কা কাজের মেয়ে চাকাওলা ট্রলিতে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল। সেন্টার টেবলে ফল, কর্ণফ্লেকস, দুধ, টোস্ট, মাখন, সুগার কিউব, জেলি, অমলেট, টি-পট, মিল্কপট, খালি কাপপ্লেট নামিয়ে রেখে ট্রলি নিয়ে হল-ঘর থেকে সে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল। একেই বিন্দুবাসিনীদের ব্যালকনি থেকে দু-একবার দেখেছে রণিতা। অনুমান করা যায়, সে যখন টয়লেটে সেই সময় নয়নতারা কাজের মেয়েটিকে ব্রেকফাস্টের কথা বলে দিয়েছিলেন।

নয়নতারা বলেন, 'শুরু কর।'

এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা পাবে, ভাবে নি রণিতা। কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'কিন্তু—'

'তোমার মতো স্মার্ট মেয়ের কাছে এমন সঙ্কোচ আশা করি নি। প্লিজ স্টার্ট—'

রণিতা লক্ষ করল, একজনের মতো খাদ্যবস্তু আনা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ব্রেকফাস্ট?'

নয়নতারা বলেন, 'দু'কাপ বেড টি ছাড়া সকালে আমি আর কিছু খাই না। সাড়ে পাঁচটায় আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে।'

রণিতা আর কোনো প্রশ্ন করে না। তার ব্রেকফাস্ট শেষ হলে নয়নতারা টি-পট থেকে একটা কাপে সোনালি লিকার ঢেলে তাতে দুধ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ক'টা সুগার কিউব দেব?'

নয়নতারা নিজের হাতে তাকে চা করে খাওয়াবেন, এটা ছিল অকল্পনীয়। অভিভূতের মতো রণিতা বসে থাকে। বলে, 'একটা—'

চামচে করে সুগার কিউব তুলে চায়ে মিশিয়ে রণিতাকে কাপটা দিতে দিতে নয়নতারা বলেন, 'এবার আমার সেই প্রশ্নটার উত্তর দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না রণিতা। চায়ে একটা হালকা চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করে, 'চতুর শব্দটা ভাল না।'

'বুদ্ধিমতীটাই পছন্দ তোমার?'

অল্প হেসে মাথা হেলিয়ে দেয় রণিতা।

নয়নতারা সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে এবার বলেন, 'কিন্তু তুমি যেভাবে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছ তাতে বুদ্ধির পরিচয় নেই। যা রয়েছে তা হল ঝুঁকি, মারাত্মক ধরনের রিস্ক। এভাবে পর পর পাঁচদিন ঢোকাটা ঠিক হয় নি।'

রণিতা হকচকিয়ে যায়, 'কিভাবে ঢুকেছি?'

নয়নতারা হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। কয়েক পা গিয়ে পুব দিকের একটা জানালা খুলে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, 'ঐ দেখ—'

রণিতার চোখে পড়ে জামগাছের ডাল থেকে নাইলনের সেই দড়িটা আংটাসুদ্ধ এখনও ঝুলছে। কাল ভোরে এপারে নামার পর ওটা খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু নয়নতারা যে ওটা লক্ষ করবেন, কে ভাবতে পেরেছে! রণিতার মুখে বোকাটে নার্ভাস একটু হাসি ফোটে। পাঁচদিনের কথা বলেছেন নয়নতারা। তার মানে ওঁর চোখকে একদিনও ফাঁকি দিতে পারে নি সে।

জানালাটা বন্ধ করে নয়নতারা ফিরে আসেন। বসতে বসতে বলেন, 'কাল ঠিক ক'টায় এ বাড়িতে ঢুকেছ?'

রণিতা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। মুখ নামিয়ে বলে, 'ভোর চারটেয়—'

নয়নতারা বলেন, 'তার মানে তখনও বেশ অন্ধকার ছিল।'

'ছিল।'

'অন্ধকারে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, না কী বল?'

'না।'

একটু অবাকই হন নয়নতারা, 'না!'

বিন্দুবাসিনীকে যা বলেছিল, নয়নতারাকেও তা-ই বলে রণিতা। অর্থাৎ মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং নেবার ফলে নিজেকে বাঁচিয়ে উঁচুতে ওঠার বা নিচে নামার কায়দাটা সে ভালই রপ্ত করেছে।

নয়নতারা ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে বলেন, 'আই সি, আই সি। আর কত বাড়িতে এভাবে ঢুকেছ?'

'আর কোথাও ঢুকিনি। আপনার বাড়িতেই প্রথম এবং খুব সম্ভব আপনার বাড়িতেই শেষ।'

'এবার সেকেন্ড ঝুঁকিটার কথা বলি।'

রণিতা মুখ তুলে উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে থাকে।

নয়নতারার চোখেমুখে হঠাৎ কঠোরতা ফুটে বেরোয়, কিছুটা রূঢ় গলায় বলেন, 'ট্রেসপাসিংয়ের জন্যে আমি তোমাকে পুলিশের হাতে এখনই তুলে দিতে পারি জানো?'

রণিতা কিন্তু ভয় পায় না। তার ভেতরকার সাহসী, ঝকঝকে, সপ্রতিভ তরুণীটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। বলে, 'পারেন কিন্তু তা করবেন না।'

নয়নতারার ফর্সা মসৃণ কপাল সামান্য কুঁচকে যায়। জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'পুলিশকে খবর দিলে তক্ষুনি সারা দেশ জেনে যাবে নয়নতারা দেবী কোথায় আছেন।'

নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না, ঠোঁট টিপে চোখ বুজে কিছু ভাবতে থাকেন। নিঃশব্দে তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে যায় রণিতা।

একসময় চোখ মেলে নয়নতারা বলেন, 'পুলিশকে ফোন না করলেও সে ভয়টা তো এখনও আছে।'

রণিতা জানতে চায়, 'কিরকম?'

'তুমি আমাকে খুঁজে বার করেছ, তুমিই তো ঢাক ঢোল পিটিয়ে সারা পৃথিবীকে সেটা জানিয়ে দিতে পার।'

'নো নো— নেভার। আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, আপনার পারমিসান না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে কিছু বলব না। আপনার শান্তি নষ্ট হয়, আপনি অসন্তুষ্ট হন, এমন কাজ কি করতে পারি?'

নয়নতারার মুখ এবার কোমল দেখায়, যেন বেশ আশ্বস্ত হয়েছেন এমনভাবে বলেন, 'ওয়ার্ড অফ অনার?'

'ওয়ার্ড অফ অনার।' রণিতা বলে, 'আপনি আমাকে আজ প্রথম দেখলেন, তবু বলছি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

'করলাম।' নয়নতারা হাসলেন। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি একলা বার্লিন ওয়াল ডিঙোলে যে? সেই ছোকরা কোথায়?'

রণিতা চকিত হয়ে ওঠে, 'কার কথা বলছেন?'

'ঐ যে পাশের বাড়ির ব্যালকনিতে বসে বিন্দুবাসিনী দেবী, তুমি আর যে যুবা পুরুষটি সকাল-সন্ধে চোখে দূরবীন লাগিয়ে ষড়যন্ত্র করতে আমি তার কথা

বলছি।' মজাদার হাসিটা দ্রুত রং পালটে ফিচেল হয়ে নয়নতারার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

চোখেমুখে যার কথার খই ফোটে সেই রণিতা দু'বার আপনি-আপনি করে থেমে যায়।

নয়নতারা আরো ঝুঁকে আসেন, 'আমি কী?'

'আপনি আমাদের লক্ষ করেছেন?'

'বা রে, তোমরাই শুধু আমার ওপর নজর রাখবে আর আমি চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, তাই কখনও হয়? একটু ওয়েট কর।'

নয়নতারা আরেক বার উঠে পড়েন, ডান পাশের একটা ঘর থেকে একটা বাইনোকুলার হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এসে বলেন, 'তোমাদের মতো আমারও একটা পাওয়ারফুল দূরবীন আছে। এটা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমিও কিছুটা যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করি।'

চুরি ধরা পড়ার পর মানুষের যা হয়, রণিতার হাল অনেকটা সেইরকম। কারো বাড়ির ওপর নজরদারি করার সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য কী কৈফিয়ত তৈরি করা যায়, মনে মনে সে যখন ভাবছে সেই সময় ফোন বেজে ওঠে।

হল-ঘরে সোফার পাশে একটা নিচু স্ট্যান্ডে যে টেলিফোন রয়েছে, আগে লক্ষ করেনি রণিতা। নয়নতারা ফোনটা তুলে নিয়ে খাঁটি ঢাকাইয়া উচ্চারণে গেঁয়ো মেয়েদের মতো কথোপকথন চালিয়ে যান।

ওধারের কথা কিছুই শোনা যাচ্ছে না। নয়নতারা বলছেন, 'কারে চাইতে আছেন?... নাই, বাড়িতে নাই..... মেমসাব কহন (কখন) বাইর হন, কহন ফিরেন তেনিই জানেন... আর জানেন মা কালী... আইচ্ছা... যহন ইচ্ছা ফোন কইরেন.... পাইবেন না তেনারে...আইচ্ছা তেনার নাম?... নয়নতারা বইলা কারোরে চিনি না...যিনি আছেন তেনারেই চাই ?..... আইচ্ছা যহন ইচ্ছা ফোন কইরেন... পাইবেন না তেনারে... কুনোদিনই পাইবেন না... পন্নাম (প্রণাম)। রাখি....'

প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সফিস্টিকেটেড, গ্ল্যামারাস নয়নতারা যে এত দ্রুত একটি গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকায় নেমে আসতে পারেন, কে ভাবতে পেরেছিল! চমৎকৃত, মুগ্ধ রণিতা তাকিয়ে তাকিয়ে নয়নতারাকে দেখছিল। তিনি ফোনটা নামিয়ে রাখতেই সে বলে ওঠে, 'আপনার ঐ গলার স্বর আর ল্যাংগুয়েজ আমার খুব চেনা।'

নয়নতারা অবাক হন না। বলেন, 'তার মানে তুমিও ফোনে আমাকে ধরতে চেয়েছ?'

'দু-তিন বার। আর প্রতি বারই ঐ কথাগুলো শুনতে পেয়েছি।'

'কী করি বল, আমি তো নির্বাসনই বেছে নিয়েছি। কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না, তবু কেউ যদি জোর করে গায়ে এসে পড়ে তাকে তো এভাবেই অ্যাভয়েড করতে হয়। এড়িয়ে যাবার আর কোনো মেকানিজম আমার জানা নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা বলেন, 'এবার বল ঐ ছেলেটি তোমার সঙ্গে এল না কেন?'

অমিতেশকে আনার অসুবিধাটা কোথায় ছিল বুঝিয়ে দেয় রণিতা। ট্রেসপাসিংয়ের জন্য মেয়ে বলে সে পার পেতেও পারে কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে বিপদটা অনেক বেশি।

নয়নতারা বলেন, 'তা অবশ্য ঠিক। ছেলেটির কী নাম?'

রণিতা অমিতেশের পুরো নামটা পদবিসুদ্ধু জানিয়ে দেয়।

নয়নতারার দুই চোখে দুষ্টুমি নাচানাচি করতে থাকে। গলার স্বর আচমকা অনেকখানি খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'অমিতেশের সঙ্গে তোমার রিলেশানটা কী? বয়ফ্রেন্ড?'

লজ্জা পায় রণিতা, জড়ানো আবছা গলায় কিছু একটা বলে যায় যার একটি বর্ণও বোঝা যায় না।

নয়নতারা এবার বলেন, 'তবে কি লাভার? প্রেমিক?'

রণিতার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যায়।

নয়নতারা বলেন, 'বুঝেছি। কিছু বলতে হবে না।' একটু থেমে ফের বলেন, 'একটা ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে রণিতা।'

'কী?'

'আমার এই বাড়িটা তোমরা খুঁজে বার করলে কী করে?'

কিভাবে খুঁজে পেয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যায় রণিতা, শুধু খোঁজার কারণটা আপাতত জানায় না। সুযোগ এবং নয়নতারার মুড বুঝে সেই প্রসঙ্গটা তুলবে।

ঘন পালকে-ঘেরা নয়নতারার টানা চোখ দু'টি বিস্ময়ে গোল হয়ে যায় বলেন, 'আরে বাবা, এ যে বিরাট এক্সপিডিশান! বাংলায় কী একটা দারুণ গর্জাস কথা আছে না— ও হ্যাঁ, অধ্যবসায়। তোমাদের দেখছি সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। আমি হলে কিন্তু কিছুতেই পারতাম না।'

রণিতা বলে, 'আপনার মতো একজন শিল্পীর জন্যে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি।'

'ফ্ল্যাটারি?'

'বিশ্বাস করুন, একেবারেই না।'

রণিতার বলার মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা রয়েছে যা নয়নতারার বুকের ভেতরকার সূক্ষ্ম তারে আলতো ঝঙ্কার তুলে যায়। মেয়েটিকে তাঁর ভাল লাগতে শুরু করে। হাসিমুখে বলেন, 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম।'

একটু চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা বলেন, 'এবার তোমাকে আমি সবচেয়ে ভাইটাল প্রশ্নটা করব।'

রণিতা উৎসুক চোখে তাকায়। ভেতরে ভেতরে একটু উৎকণ্ঠাও বোধ করে, যদিও এখন পর্যন্ত নয়নতারাকে যেটুকু দেখেছে তাতে মনে হয়েছে এই কিংবদন্তির নায়িকা রহস্যময় সুদূর নীহারিকায় ভাসমান রঙিন কোনো ফানুস নন, একান্তভাবে চেনা পৃথিবীরই মানুষ— সহৃদয়, সহানুভূতিশীল, স্নেহপ্রবণ। তিনি নিশ্চয়ই তাকে বিপাকে ফেলবেন না।

নয়নতারা বলেন, 'তোমাকে যেটুকু দেখলাম, কথা বলে যা বুঝলাম, তাতে উন্মাদের মতো ফিল্মস্টারের পেছনে তুমি ছুটবে না। তেমন রুচি বা শিক্ষাদীক্ষাও তোমার নয়।'

রণিতা তাকিয়েই থাকে।

নয়নতারা থামেন নি, 'তা হলে এতটা ঝুঁকি নিয়ে রাতের অন্ধকারে এ বাড়িতে ঢুকেছ কেন? উদ্দেশ্য কী তোমার?'

দ্বিধান্বিতভাবে রণিতা বলে, 'আজ বলতে সাহস হচ্ছে না। আমাকে দু-একটা দিন সময় দিন।'

নয়নতারা সোজাসুজি রণিতার চোখের দিকে তাকান, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বলেন, 'তুমি শুধু ইনটেলিজেন্টই নও, অসম্ভব ধুরন্ধর। আরেক দিন এ বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করে রাখতে চাইছ?'

'শুধু আরেক দিন কেন, আপনার অনুমতি পেলে আরো অনেক, অনেক দিন আমাকে এখানে আসতে হবে।'

রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলেন নয়নতারা, 'নটি গার্ল। ভীষণ খলিফা তুমি।'

নয়নতারার মুখে 'খলিফা' কথাটা শুনবে ভাবতে পারেনি রণিতা। এসব

শব্দ তো অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে থাকে। দেখা যাচ্ছে বাড়ির ভেতর নির্বাসন বেছে নিলেও বাইরের অনেক কিছুই তিনি জানেন।

নয়নতারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার তাকে বলেছেন চতুর, একবার ধুরন্ধর, একবার নটি গার্ল এবং খলিফা। পাঁচিল ডিঙোবার জন্য তিনি যে খেপে যান নি তা তো আগেই বুঝে গেছে রণিতা। বরং বেশ মজা পাচ্ছেন, সেটাও তার কাছে আর অস্পষ্ট নেই।

নয়নতারা কিছুক্ষণ ভেবে বলেন, 'তুমি প্রমিস করেছ আমার কথা বাইরের কাউকে জানাবে না।'

রণিতা বলে, 'করেছি।'

'সেই শর্তেই তোমাকে আরেক দিন এ বাড়িতে ঢোকার পারমিসান দেব। যদি দেখি শর্ত ভাঙো নি, এখানকার দরজা চিরকালের মতো হয়তো তোমার কাছে খুলেও যেতে পারে।'

'ধন্যবাদ। আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব—'

হাত তুলে রণিতাকে থামিয়ে দিতে দিতে নয়নতারা বলেন, 'ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার দরকার নেই। আট বছর স্টেজ আর সিনেমা ওয়ার্ল্ডের বাইরে রয়েছি আমি। তবু এখনও আমাদের দেশের তো বটেই—পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার বহু মানুষ আমাকে দেখতে চায়, অনেকেই ফোন করে। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আমার নাম ছাপা হয় না, ওটা আনলিস্টেড। তবু কী করে যে লোকে জানতে পেরেছে কে জানে!'

রণিতা বলে, 'মনে হয় আমি যেভাবে জেনেছি সেইভাবেই—'

'আরে তাই তো। তোমার কে এক আত্মীয়ের কথা বলছিলে না, টেলিফোনের বড় অফিসার। কিরকম আত্মীয় হন?'

'সম্পর্কে দাদা হন।'

'এইরকম সব সোর্স থেকেই জানাজানি হয়েছে। তবে আমি ধরা দিই না। পরিষ্কার বলি নয়নতারা নামে এ বাড়িতে কেউ থাকে না।'

'সে তো এখন নিজের চোখেই দেখলাম। আগে কানেও শুনেছি।'

নয়নতারা একটু হাসেন, 'একটা সুবিধে হয়েছে, এই গোপন টেলিফোনটি নয়নতারার নামে নেই। ফলে অনেকেই ধাঁধায় পড়ে যায়—'

রণিতা বলে, 'আমিও পড়েছিলাম। মমতা রায় কে?'

'আমিই মমতা রায়। ওটা আমার বাবার দেওয়া নাম। আরো একটা নাম আছে আমার—লক্ষ্মী। নয়নতারা আমার স্ক্রিন নেম।'

একটু চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা ফের শুরু করেন, 'সে যাক, অন্য যারা ফোন করে বা আমাকে দেখতে চায় তুমি যে তাদের মধ্যে পড় না, সেটা বুঝতে পেরেছি। কেন এত কষ্ট করে এ বাড়িতে ঢুকেছ জানার জন্যে যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু তুমি তো আজ মুখ খুলবে না। কবে আসতে চাও?'

রণিতা বলে, 'যেদিন আপনি সময় দেবেন।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নয়নতারা বলেন, 'নেক্সট উইকের বুধবার, সকাল ন'টায়। অসুবিধে হবে?'

'একেবারেই না। আপনি যদি মাঝরাতে আসতে বলেন, তাই আসব।'

নয়নতারা শুধু হাসেন।

রণিতা বলে, 'আজ তা হলে আমি যাই?'

নয়নতারা বলেন, 'আচ্ছা। বুধবার পাঁচিল টপকে আসার দরকার নেই, সোজা গেট দিয়ে ঢুকবে। আর—'

'আর কী?' উৎসুক সুরে জানতে চায় রণিতা।

নয়নতারা বলেন, 'যদি ইচ্ছে হয়, তোমার সেই বয়ফ্রেন্ড বা প্রেমিক ছোকরাটিকেও সঙ্গে আনতে পার। তবে তাকে আমার শর্তটা জানিয়ে দিও।' তাঁর চোখের তারায় দুষ্টুমির মতো কিছু একটা নেচে যায়।

পনেরো

পর পর পাঁচদিন ভোরে জামগাছ থেকে ঝুলে নামতে হয়েছে বটে, তবু এত সহজে নয়নতারার কাছে পৌঁছনো যাবে, ভাবতে পারে নি রণিতা। একরকম অযাচিতভাবেই সুযোগটা এসে গেছে। এখন সেটা সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে আদৌ ওঁকে ডকু-ফিচারের ব্যাপারে রাজি করানো যাবে কিনা কে জানে। তবে রণিতা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে।

নয়নতারার সঙ্গে সেদিন তার কী কথাবার্তা হয়েছে, কেমন ব্যবহার তাঁর কাছে পাওয়া গেছে, সব কিছু সেদিনই রণিতা জানিয়ে দিয়েছিল বিন্দুবাসিনী, অমিতেশ আর ইন্দ্রনাথকে। তিনজনই দারুণ উৎসাহিত। ওঁদের স্থির বিশ্বাস ডকু-ফিচারটা করা যাবে এবং সাংস্কৃতিক জগতের সেটা হবে বিরাট এক ঘটনা।

রণিতা তিনজনকেই বার বার নয়নতাবার শর্তের কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে। তাঁর সঙ্গে যে যোগাযোগ হয়েছে সেটা যেন কোনোভাবেই চাউর হয়ে না যায়। তা হলে চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটে আর ঢোকার সম্ভাবনা থাকবে না।

পরের সপ্তাহের বুধবার সকাল ন'টায় অমিতেশকে সঙ্গে করে রণিতা নয়নতারার বাড়ির সামনে এসে কলিং বেল বাজায়। আজও একটা ব্যাগে পুরে ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডার এনেছে সে। যদি কোনোভাবে নয়নতারাকে রাজি করানো যায়, আজই তাঁর ছবিটবি তুলে, কথাবার্তা রেকর্ড করে প্রাথমিক কাজ শুরু করে দেবে।

গেটের সেই চৌকো জানালাটা খুলে দারোয়ান রণিতাদের দেখে নিঃশব্দে একমুখ হাসে। তারপর গেটটা খুলে দেয়। দু'জনে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

রণিতাদের কথা নিশ্চয়ই দারোয়ানকে জানিয়ে রেখেছিলেন নয়নতারা নইলে এমন মধুর হাসি তার মুখে দেখা দিত না।

দারোয়ান বলে, 'মেমসাব উপরমে হ্যায়। যাইয়ে—'

রণিতা আর অমিতেশ বাগান ডান দিকে রেখে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে বাড়িতে চলে আসে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রণিতা লক্ষ করে, উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে অমিতেশ। চারদিন আগে এই সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অবিকল এইরকমই কিছু একটা তারও হয়েছিল।

নয়নতারা তাদের জন্য দোতলার হল-ঘরে একটা সোফায় বসে অপেক্ষা করছিলেন। বোঝা যায়, এর মধ্যে তাঁর স্নান হয়ে গেছে। পরনে ধবধবে সাদা চিকনের কারুকাজ-করা শাড়ি আর তসরের ব্লাউজ। স্নানের পর সব মেয়েকেই ভারি পবিত্র দেখায়। নয়নতারাকে আলৌকিক কোনো দেবী মনে হচ্ছিল।

নয়নতারা হেসে বললেন, 'এস এস—বস—' রণিতারা বসলে সকৌতুকে অমিতেশের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার কাজটা কিন্তু কাপুরুষের মতো হয়েছে।'

অমিতেশ হকচকিয়ে যায়। বুঝতে না পেরে বলে, 'মানে—আমি—'

'বান্ধবীকে পাঁচদিন ভোরে একা একা পাঁচিলের এপারে পাঠিয়ে নিজে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলে। স্ট্রেঞ্জ!' বলে চোখ সামান্য কুঁচকে অমিতেশকে লক্ষ করতে থাকেন নয়নতারা।

হতচকিত ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে ওঠে অমিতেশ। বলে, 'ওর সঙ্গে আমারও পাঁচিল টপকানো উচিত ছিল, তাই বলছেন?'

'রাইট।'

'আপনার মধ্যে এতটা গ্রেটনেস আছে ভাবতে পারি নি, আগে জানলে রণির সঙ্গে প্রথম দিনই পাঁচিল টপকাতাম।'

গম্ভীর ভারি গলায় নয়নতারা বলেন, 'কী ভেবেছিলে, আমার ভেতর যা আছে সবটাই মীননেস—নীচতা?'

হতচকিত অমিতেশ সজোরে দু হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'না না, এ আপনি কী বলছেন!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে অত বিব্রত হতে হবে না। ফিল ফ্রি।' নয়নতারা কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে হাসেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই যে তাঁর মজা, বুঝতে পেরে আরাম বোধ করে অমিতেশ। বলে, 'আমাকে এমন ঘাবড়ে দিয়েছিলেন—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে নয়নতারা বলেন, 'তোমাদের দু'জনের নাম ছাড়া আর কিছুই প্রায় জানি না। কী কর তোমরা?'

অমিতেশ দ্রুত একবার রণিতার দিকে তাকায়। অর্থাৎ এক্ষুনি নিজেদের আসল পরিচয়টা দেওয়া ঠিক হবে কিনা, সেটা ওর কাছ থেকে বুঝে নিতে চাইছে। কিন্তু সে কিছু বোঝার আগেই খুব সহজভাবে রণিতা নয়নতারাকে বলে, 'অমিতেশ সম্পর্কে আপনাকে সেদিন বলেছিলাম। ও একটা কাগজে কাজ করে—রোভিং রিপোর্টার। মনে পড়ছে?'

নয়নতারা বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম কী যেন বলেছিলে। আর তুমি?'

'আমি পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে চার বছর আগে পাস করে বেরিয়েছি। আমার সাবজেক্ট ছিল ফিল্ম ডিরেকশান। এখন শর্ট ফিল্ম মানে ডকুমেন্টারি ধরনের ছবি করছি।' বলে সোজাসুজি নয়নতারার দিকে তাকায় রণিতা।

নয়নতারা কিছু মনে করার চেষ্টা করেন। তারপর বলেন, 'দিন পনেরো আগে আসামের মিকির ট্রাইবকে নিয়ে তোমার একটা ডকুমেন্টারি কি টিভিতে দেখানো হয়েছিল?'

'আপনি দেখেছেন!' রণিতার চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই।' নয়নতারা বলেন, 'এখন তো আমার প্রচুর অবসর। টিভি দেখে দেখে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিই।' একটু থেমে বলেন, 'আজকাল মেয়েরা ফিল্ম ডিরেকর্শনে আসছে, এটা খুব ভাল ব্যাপার। এই ফিল্ডটাতেও পুরুষদের মনোপলি ভাঙছে। মেয়েরা আর কোনো দিকেই পিছিয়ে থাকছে না।' বলে সকৌতুকে অমিতেশের দিকে তাকান। বিশাল হল-ঘরটায় পুরুষ জাতির একমাত্র প্রতিনিধি অমিতেশ, দেখা গেল, মেয়েদের এই অগ্রগতিতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। নয়নতারার বলার ভঙ্গিতে সেও হেসে ফেলে।

নিজের ডকুমেন্টারিটা সম্পর্কে নয়নতারার মন্তব্য শোনার জন্য ভেতরে ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিল রণিতা। সে জিজ্ঞেস করে, 'আমার ছবিটা কেমন লাগল?'

নয়নতারা বলেন, 'চমৎকার। ওটা করার জন্যে তোমাকে বেশ রিসার্চ করতে হয়েছে, তাই না?'

রণিতা জানায়, ছ'মাস মিকিরদের নিয়ে লেখা নানা বইপত্র পড়েছে সে, লামডিংয়ে গিয়ে একটা মিকির গ্রামে তিন মাস কাটিয়ে ওদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে, তারপর ছবির কাজে হাত দিয়েছে।

'সেই জন্যেই ছবিটা এত টাচিং, ডিটেলের কাজ এত ভাল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা রণিতাকে বলেন, 'আশা করি এ ক'দিনে তোমার নার্ভাসিনেস কেটে গেছে। আমার বাড়িতে হানা দেবার কারণটা আজ নিশ্চয়ই জানাবে।'

রণিতা বলে, 'হ্যাঁ।' নয়নতারাকে নিয়ে ডকু-ফিচারের যে পরিকল্পনাটা করেছে সেটা জানিয়ে সে বলে, 'আমার ধারণা, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

নয়নতারার চেহারাটা পলকে আদ্যোপান্ত বদলে যায়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে রুক্ষভাবে তিনি বলেন, 'অসম্ভব—'

রণিতা ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'আপনার মতো একজন গ্রেট আর্টিস্ট—'

আঙুল তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নয়নতারা বলেন, 'স্টপ ইট, প্লিজ স্টপ। আট বছর আমি দূরে সরে নিজের মতো করে বেঁচে আছি। বাইরের ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ নেই। বিশেষ করে প্রিন্ট আর অডিও ভিসুয়াল মিডিয়ার লোকেদের আমি অপছন্দ করি। আমি চাই না তারা আমার শান্তিভঙ্গ করুক।'

রণিতা কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু তার সুযোগ পায় না। তার আগে ফের একই সুরে নয়নতারা বলে যান, 'তোমরা বিন্দুবাসিনী দেবীদের বাড়ি থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দিনের পর দিন আমাকে খুঁজতে, সে জন্যে একটু কৌতূহল হয়েছিল, তাই এ বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের এরকম একটা ইনটেনসান রয়েছে, তখন জানতাম না।'

'জানলে কি ঢুকতে দিতেন না?'

'আমার জবাব—অবশ্যই না। তোমরা মিডিয়ার লোকেরা আমার প্রচুর ক্ষতি করেছ। তোমাদের সঙ্গে আমি কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

রণিতা বুঝতে পারছিল, যে কোনো কারণেই হোক, মিডিয়ার ওপর নয়নতারা খুবই অসন্তুষ্ট। হয়তো সেখান থেকে তিনি কোনো আঘাত পেয়েছেন আর সেটা তাঁর মাথায় চেপে বসে আছে, কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। যেভাবে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন তাতে ডকু-ফিচারটার আশা আর নেই। রণিতা প্রায় মরিয়া হয়ে ওঠে, 'আপনি মিডিয়াকে ঘৃণা করেন?'

থমথমে মুখে নয়নতারা বলেন, 'ইয়েস, আই ডু।'

'কিন্তু—'

'আবার কী? তোমাকে তো পরিষ্কার বলে দিলাম—'আই হেট, আই হেট, আই হেট—'

রণিতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'একটা কথা ভেবে দেখেছেন?'

নয়নতারা বলেন, 'কী ভাবার কথা বলছ?'

'আপনি আজ যা, তার সবটুকুই মিডিয়ার তৈরি। দিনের পর দিন কাগজে আপনার সম্বন্ধে লিখে, অজস্র ছবি ছেপে, টিভিতে অনবরত আপনার ফিল্ম দেখিয়ে, রেডিওতে আপনার সম্পর্কে বলে বলে একটা লিজেন্ড বানিয়ে দিয়েছে। আপনাকে ঘিরে আজ এত যে মিথ সেটা মিডিয়ারই জন্যে। ইউ আর মিডিয়া-ক্রিয়েটেড। আর বলছেন কিনা আপনি আমাদের ঘৃণা করেন!'

রণিতা যে এভাবে বলতে পারে, ভাবতে পারেন নি নয়নতারা, একটু থমকে যান তিনি। পরক্ষণে বলে ওঠেন, 'কে চেয়েছিল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে 'মিথ' বানিয়ে আমাকে সুপার হিউম্যান করে তুলতে? আসলে কাগজ যাতে বেশি কাটে, রেডিও আর টিভি'র যাতে আকর্ষণ বাড়ে সেই জন্যে আমাকে লিজেন্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তা চাই নি।'

'কী চেয়েছিলেন আপনি?'

'একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে।'

এরপর কী বলা উচিত, রণিতা ঠিক করতে পারছিল না। এত গ্ল্যামার, এত মিথ, কোটি কোটি মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে দিনের পর দিন থেকে যাওয়া—একজন চিত্রতারকার কাছে এসব যে সেভাবে কাম্য নয়, এই প্রথম জানতে পারল রণিতা। অবাক চোখে সে নয়নতারার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নয়নতারা বলে যাচ্ছিলেন, 'মিডিয়া আমার কী করেছে ভাবতে পার? আট বছর আগে আমি কোথাও বেরুতে পারতাম না, কারো সঙ্গে মিশতে পারতাম না। লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখ তখন আমার দিকে, হাজার হাজার ক্যামেরা আমাকে ফলো করে যাচ্ছে। ফ্রিলি নিশ্বাস নিতে পারি না, স্বাভাবিক জীবনযাপন বলতে

আমার কিছুই নেই। বানিয়ে বানিয়ে অসংখ্য স্ক্যান্ডাল বানিয়ে মদের চাটের মতো বিলানো হচ্ছে। আমার প্রাইভেসি বলতে কিছু নেই। ঘরের ভেতর কী করি, ঘরের বাইরে কোথায় যাই, সব পরদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়ে যায়। এমন সব কুৎসাও বেরোয় যার সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই। তোমরা আমার নিজস্ব ওয়ার্ল্ড বলতে কিছু রাখো নি, বাইরের ওয়ার্ল্ডও কেড়ে নিয়েছ।'

ঝোঁকের মাথায় বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে থমকে যান নয়নতারা। হয়তো তাঁর মনে হয়, অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে। এতটা বিস্ফোরণের প্রয়োজন ছিল না। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বলেন, 'তোমরা এখন যেতে পার।'

রণিতা হতাশ গলায় বলে, 'ডকু-ফিচারটার কী হবে?'

'কিছুই হবে না, আমি রাজি নই।'

'কিন্তু দেশের মানুষের আপনার সম্বন্ধে কতটা আগ্রহ, কতটা শ্রদ্ধা তা বোধহয় আপনার জানা নেই। এসব উপেক্ষার জিনিস নয়। আপনি কি একবার ভেবে দেখবেন? আমরা না হয় অন্য দিন এসে জেনে যাব।'

নয়নতারা বলেন, 'না। আট বছর সবার সামনে থেকে দূরে সরে এসে নিজের মতো করে আমি বেঁচে আছি। ডকু-ফিচার মানেই নতুন করে মানুষের নজর আবার আমার ওপর এসে পড়বে। আবার খবরের কাগজ, টিভি, রেডিওর ঝঞ্ঝাট। আমার শান্তি নষ্ট হোক, এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। প্লিজ কুইট।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে সেন্টার টেবলে রেখে রণিতা বলে, 'এটা থাকল। যদি ডকু-ফিচারের ব্যাপারে কখনও আপনার সিদ্ধান্ত পালটায় দয়া করে ফোন করবেন।'

'পালটাবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা বলেন, 'তোমরা হয়তো আমার ওপর রেগে গেলে। তবু একটা অনুরোধ করব।'

রণিতা বলে, 'রাগ করব কেন? আপনার অনুরোধটা কী?'

এই সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

নয়নতারা বলেন, 'এক মিনিট—' ক'পা এগিয়ে সেই নিচু স্ট্যান্ডটা থেকে ফোন তুলে জিজ্ঞেস করেন, 'কাকে চান—ও সমরেশ—'

চকিতে রণিতা আর অমিতেশ পরস্পরের দিকে তাকায়। ঐ নামটা তাদের অজানা নয়। সেদিন যে বেনামা চিঠিটা এসেছিল তাতে নয়নতারার প্রিয় বন্ধু এবং অন্ধ অনুরাগী সমরেশ ভৌমিকের কথা সাতকাহন করে লেখা ছিল। নিজেদের

অজান্তেই তাদের সমস্ত স্নায়ু টান টান হয়ে যায়। যে লোকটি আট বছর আগে ঘর সংসার ফেলে রেখে অদ্ভুত এক নেশার ঘোরে নয়নতারার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, এতকাল বাদে তাদের দু'জনের সম্পর্কটা কতখানি বজায় রয়েছে সেটা বোঝার জন্য টেলিফোনের দিকে কান খাড়া করে রাখে। অবশ্য রণিতারা বাইনোকুলার দিয়ে এ বাড়িতে আগেই সমরেশ ভৌমিককে একবার দেখেছে। সম্পর্কটা ভাল না থাকলে নয়নতারা কি তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিতেন?

নয়নতারা বলছিলেন, 'কসবার কোন জমিটা?.. আঠারো নম্বর রজনী দত্ত রোডেরটা কি?....ও পাঁচ কাঠা... চারতলা বাড়ি করতে হবে...বত্রিশটি মেয়ের শেলটার ওর কমে কুলোবে না...বায়না করে নাও..জমির টাকাটা আমিই দিতে পারব...কিন্তু বাড়ি করার মতো অত টাকা আমার নেই...হ্যাঁ, কিছু একটা করতেই হবে....অতগুলো হেল্পলেস মেয়ে....কবে আসছ?.... কাল বিকেলে..ঠিক আছে, ঠিক আছে...কাল সকালে তোমার ফ্ল্যাটে ফোন করব...আর কী...ও হ্যাঁ হ্যাঁ...ওখানে ওষুধ কিনে দিও...তোমার কাছে হাজার দুই টাকা আছে তো...পরে দেখা যাবে...।'

কসবায় জমি কিনে একটা বাড়ি করতে চান নয়নতারা, এটুকু বোঝা গেল। আর জানা গেল, সমরেশ ভৌমিক তাঁর সঙ্গে এ বাড়িতে থাকেন না। সমরেশের আলাদা ফ্ল্যাট আছে। যে বত্রিশটি সহায়সম্বলহীন মেয়ের জন্য একটা বাড়ি করার উদ্যোগ নিয়েছেন নয়নতারা তারা কারা? সেটা ধরা গেল না। কথাবার্তা শেষ করে ফোন নামিয়ে রণিতাদের কাছে ফিরে আসেন নয়নতারা। বলেন, 'তোমাদের অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। হঠাৎ ফোনটা এসে গেল কিনা—'

রণিতা বলে, 'ঠিক আছে। আপনার কী একটা অনুরোধ আছে—'

নয়নতারা বলেন, 'হ্যাঁ। আমি যে এখানে আছি সেটা জানাজানি যেন না হয়। তোমাদের প্রোপোজালে রাজি হই নি। আশা করি মনের ক্ষোভে এমন কিছু করবে না যাতে আমি বিপন্ন হয়ে পড়ি।'

'আপনাকে তো সেদিনই বলে গেছি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, আমরা বিট্রে করব না। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কাব।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে হতাশ ভঙ্গিতে অমিতেশ বলে, 'তিনটে মাস এত খাটুনি আর চারদিকে ছোটাছুটিই সার হল।'

অমিতেশের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রণিতা কিছু ভাবছিল। অন্যমনস্কর মতো বলে, 'হুঁ—'

'এবার কী করবে?'

'দেখি।'

'মান্ডি হাউসকে তো জানিয়ে দিয়েছিলে ডকু-ফিচারটা করতে পারবে এখন ওদের কী বলবে?'

'ক'টা দিন ওয়েট করি। যদি নয়নতারার মত বদলায়, ফাইন। নইলে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আমার পক্ষে সম্ভব হল না।'

অমিতেশের মনে প্রচুর ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল নয়নতারা ডকু-ফিচারের ব্যাপারে আপত্তি তো করবেনই না, বরং তাঁর কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি তাদের আন্তরিকতা এবং এতদিনের পরিশ্রমকে একেবারেই মর্যাদা দিলেন না।

অমিতেশ একটু ইতস্তত করে বলে, 'তোমাকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছি।'

'কী?' রণিতা জানতে চায়।

'পকেটে একটা ছোট পাওয়ারফুল টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলাম। ওটা চালিয়ে নয়নতারার কথাগুলো রেকর্ড করে নিয়েছি। তার ওপর 'বেস' করে ওঁর সাক্ষাৎকার ছেপে দেব নাকি? ফার্স্ট ইন্টারভিউ অফ নয়নতারা আফটার এইট ইয়ারস অফ সাইলেন্স—'

রণিতা চমকে ওঠে, 'না না। ওঁকে কথা দিয়েছি, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। না জানিয়ে ওঁর কথা টেপ করে খুব অন্যায় করেছ। দিস ইজ আনএথিক্যাল।'

অমিতেশ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'আরে বাবা, আমরা কাগজের লোক, যে কোনো ভাবেই খবর জোগাড় করাটা আমাদের কাজ। অত এথিকসের ধার ধারলে কাগজ বন্ধ করে দিতে হবে।' একটু থেমে ফের বলে, 'ইন্টারভিউটা ছাপা হলে অন্তত নিজেকে বোঝাতে পারব, আমাদের এতদিনের লেবারটা একেবারে মিনিংলেস হয়ে যায় নি।'

স্থির চোখে দু-এক পলক অমিতেশের দিকে তাকিয়ে থাকে রণিতা। তারপর তাড়া দিতে দিতে বলে, 'টেপটা আমাকে দাও—'

অবাক হয়ে অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'ওটা আমার কাছে থাকবে।'

'আমার কাছে থাকলে অসুবিধাটা কী?'

'কখন নয়নতারার ওপর রাগ করে ইন্টারভিউটা ছেপে দেবে তার কি কিছু ঠিক আছে? এমন একটা লোভনীয় মেটিরিয়াল হাতের মুঠোয় থাকলে কোনো জার্নালিস্ট কি মাথা ঠিক রাখতে পারে? দিয়ে দাও বলছি—'

একরকম জোর করেই টেপ রেকর্ডারটা কেড়ে নেয় রণিতা।

টেপটা হাতছাড়া হওয়ায় গুম হয়ে গিয়েছিল অমিতেশ। তার বেজার মুখ দেখে রণিতা এবার বলে, 'তোমাদের জার্নালিস্টদের এই এক দোষ, ধৈর্যটা বড্ড কম। কিছু একটা পেলে টাটকা টাটকা সেটা ইউজ করে সেনসেসন ক্রিয়েট করতে চাও। টেপের মেটিরিয়ালটা ধরে রাখলে ভবিষ্যতে আরো অনেক বড় ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে।'

অমিতেশের এবার মনে হয় ঠিকই বলেছে রণিতা। ধরা যাক, হঠাৎ নয়নতারার মৃত্যু হল কিংবা তিনি নতুন করে ফের অভিনয়ের জগতে ফিরে এলেন, তখন এই টেপটা যে কী মূল্যবান হয়ে উঠবে ভাবা যায় না। এখন ছাপলে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে ঠিকই কিন্তু তার রেশ খুব বেশিদিন থাকবে না। নয়নতারাকে ঘিরে ভবিষ্যতে যদি বড় মাপের ঘটনা ঘটে তখন এই টেপটার এফেক্ট হবে সুদূরপ্রসারী।

অমিতেশ বলে, 'ঠিক আছে, তোমার কথামতো লোভটা এখন সামলেই রাখি।'

কথায় কথায় ওরা একটা মোড়ের মাথায় চলে এসেছিল। এখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে নিউ আলিপুরের দিকে, একটা রাজা সন্তোষ রোডের দিকে, আরেকটা রাসবিহারীতে। দু মিনিটও দাঁড়াতে হল না, রণিতারা ফাঁকা অটো পেয়ে যায়। রাসবিহারীর দিকে যেতে যেতে রণিতা বলে, 'এই যা, দারুণ একটা ভুল হয়ে গেল তো।'

অমিতেশ বলে, 'কী?'

'ডকু-ফিচারটা যে করা যাবে না, বিন্দুবাসিনী মাসিমাকে সেটা জানিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'বাড়ি গিয়ে একটা ফোন করে দিও।'

'তা তো দিতেই হব। তবে ওঁর সঙ্গে দেখা না করে আসার জন্যে খুব ক্ষুব্ধ হবেন!'

অমিতেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'তা হবেন।'

আসলে নয়নতারাকে মাঝখানে রেখে প্রীতি স্নেহ বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা—সব মিলিয়ে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তারা জড়িয়ে গেছে। নয়নতারাকে খুঁজে বার করা, তাঁকে নিয়ে ডকু-ফিচারের পরিকল্পনা—এ সবের জন্য যে টিমটা তৈরি হয়েছে তিনি তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার।

রণিতা বলে, 'ফোন তো আজ করবই, কাল তুমি আর আমি এসে একবার ওঁর সঙ্গে দেখাও করে যাব।'

'সব শুনলে উনি ভীষণ শকড হবেন।'

'হুঁ।'

চেতলা ব্রিজ পার হয়ে অটোটা কেওড়াতলার মুখে এসে ট্রাফিক জ্যামের ফাঁদে আটকে যায়। চারদিকে অজস্র গাড়ি এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে আধ ঘণ্টার আগে রাস্তা ফাঁকা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এখান থেকে রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত হেঁটে গেলে তিন চার মিনিট লাগবে। ভ্যাপসা গরমে অটোর ভেতর বসে থাকার মানে হয় না। ওরা ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে।

চলতে চলতে রণিতা বলে, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় অমিতেশ, 'কী?'

রণিতা বলে, 'দু-একদিনের ভেতর কসবায় গিয়ে আঠারো নম্বর রজনী দত্ত রোডের জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজ নেব।'

অমিতেশ চকিত হয়ে ওঠে, 'যেটা নয়নতারা কিনে নেবার জন্যে সমরেশ ভৌমিককে ফোনে বায়না করতে বললেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু শুধু এর পেছনে সময় নষ্ট করার দরকার কী?'

'ধর নিছক কৌতূহল।'

অমিতেশ রণিতাকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'বিশুদ্ধ কৌতূহলের জন্যে তুমি কসবায় ছুটবে, তা কিন্তু আমার মনে হয় না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে রণিতা। তারপর যা বলে তা এইরকম। নয়নতারার মতো একজন সুপারস্টার সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জোগাড় করেছে সে, তার বিস্তর ছবি দেখেছে, একটা নাটকের ভিডিও ক্যাসেটও। তবু তাঁর জীবনের নানা দিক এবং নানা রহস্য এখনও অজানাই থেকে গেছে। গ্ল্যামার জগতের মক্ষিরানী বত্রিশটি মেয়ের থাকার জন্য কেন গোপনে একটা বাড়ি বানিয়ে দিতে চাইছেন সেটা জানার খুব ইচ্ছা রণিতার। এই মেয়েরা কারা, সম্ভব হলে তাদেরও খুঁজে বার করবে।

রণিতা বলে, 'ব্যাপারটা হল, একজন লিজেন্ডারি নায়িকার জীবনের খানিকটা আমরা জেনেছি। বাকিটা জানতে না পারলে ওঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ইনকমপ্লিট থেকে যাবে।'

'আর জেনে কী হবে? কোনো লাভ তো নেই।'

'আর্থিক লাভের কথা আমি ভাবছি না। ধর এ টা আমার স্যাটিসফ্যাকশান।'

একসময় ওরা রাসবিহারীর মোড়ে এসে পড়ে।

ষোল

বাড়ি ফিরে বিন্দুবাসিনীকে সেদিনই ফোন করেছে রণিতা। ডকু-ফিচারটা করা যাবে না শুনে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি। বলেছেন, ওটা হল না বলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা যেন নষ্ট না হয়, রণিতারা যেন যোগাযোগটা রাখে এবং সময় পেলে ওল্ড আলিপুরে তাঁর কাছে চলে আসে। রণিতা জানিয়েছে, অবশ্যই যাবে এবং তাদের সম্পর্কটা চিরকাল বজায় থাকবে।

সেদিন রাতে ইন্দ্রনাথকেও তার ব্যর্থতার কথা জানিয়েছে রণিতা। বাবা কিন্তু চূড়ান্ত আশাবাদী, মেয়েকে তিনি উৎসাহই দিয়েছেন। তাঁর ধারণা শেষ পর্যন্ত নয়নতারা মত পালটাবেন কিন্তু বাবার মতো রণিতা অতটা আশান্বিত হতে পারে নি। নয়নতারাকে যেটুকু সে দেখেছে তাতে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল নড়বেন কিনা সন্দেহ।

মাঝখানে দিল্লি থেকে রজনীও একবার ফোন করেছিল। কাজটা কতদূর এগিয়েছে সেটা জানার জন্য সে প্রচণ্ড আগ্রহী। তাকে অবশ্য পরিষ্কার করে সবটা জানায় নি রণিতা, শুধু বলেছে আপাতত নানা কারণে ডকু-ফিচারটা করা যাচ্ছে না, দিনকয়েক পর ফোন করে বলবে কবে ওটা শুরু করা সম্ভব। শুনে প্রথমটা নিরাশ হয়ে পড়েছে রজনী, তারপর গলায় বেশ জোর দিয়ে বলেছে, 'ছবিটা তোকে করতেই হবে। শুটিং আরম্ভ হলে আমি ক'দিন কলকাতায় গিয়ে থাকব।'

দ্বিধান্বিতভাবে রণিতা বলেছে, 'আচ্ছা, থাকিস।'

সেদিন রণিতা ঠিক করেছিল কসবায় গিয়ে রজনী দত্ত রোডে সেই জমিটার খোঁজ করবে। আজ বিকেলে অমিতেশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হানা দিল সে এবং দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে জায়গাটা বারও করে ফেলল।

জমিটা চৌকো এবং বেশ উঁচু। তার একধারে ভাঙাচোরা খাপরার চালায় একটা চায়ের দোকান। বৃষকাঠের মতো চেহারা, মাঝবয়সী একটা লোক মান্ধাতার আমলের একটা ডেকচিতে চা ফোটাচ্ছিল। সামনের দুটো নড়বড়ে বেঞ্চে বসে ক'টি মজুর ক্লাসের লোক সতৃষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল।

জানা সত্ত্বেও রণিতা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি আঠারো নম্বর রজনী দত্ত রোড?'

লোকটার চোখের ডাঁটি ভাঙা নিকেলের গোল চশমা মাথার পেছন দিকে

সুতো দিয়ে বাঁধা। চশমার ওপর দিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দোকানদার জিজ্ঞেস করে, 'কেন বলুন তো?'

পালটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না রণিতা। একটু থমকে যায় সে, পরক্ষণে একটা বিশ্বাসযোগ্য জবাব মনে মনে বানিয়ে ফেলে। বলে, 'আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনব। শুনেছি এই জমিতে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি তৈরি হবে। তাই—'

লোকটা খোলা ছাড়ানো শুকনো নারকেলের মতো মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলে, 'সে গুড়ে বালি মেমসাহেব—'

'মানে?'

'এ জমি কাকে যেন বিক্রি করে দিচ্ছে মালিক। ফ্ল্যাট বাড়িটাড়ি কিসসু হবে না। যে কিনছে নিজের থাকার জন্যে বাড়ি করবে।'

'জমিটার মালিক কে?'

'অবিনাশ তরফদার।'

'তিনি থাকেন কোথায়?'

ডান পাশে তিনটে বাড়ির পর চার নম্বর বাড়িটা দেখিয়ে দেয় দোকানদার। সেখানে গিয়ে কলিং বেল টিপতেই কাজের লোক রণিতা আর অমিতেশকে সাদামাঠা একটা ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসিয়ে ভেতরে খবর দিতে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর বাষট্টি তেষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ ঘরে এসে ঢোকেন। এই বয়সেও ভারি সুপুরুষ অবিনাশ তরফদার। অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র, সৌম্য চেহারা। তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়।

রণিতারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অবিনাশ বলেন, 'বসুন আপনারা।' রণিতারা বসলে তিনিও মুখোমুখি একটা সোফায় বসেন, 'কোত্থেকে আসছেন?'

রণিতা বলে, 'আমরা কলকাতাতেই থাকি।'

'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। আঠারো নম্বর রজনী দত্ত রোডে আপনার যে জমিটা রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা ইন্টারেস্টেড। কো-অপারেটিভ করে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি বানাতাম।'

অবিনাশ বলেন, 'কিন্তু মা ওটা তো আর কাউকে দেওয়া যাবে না।'

অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'কেন বলুন তো?'

'পরশু জমিটা বায়না হয়ে গেছে।'

'বায়নার টাকাটা কি ফেরত দেওয়া যায় না?'

'তা কী করে সম্ভব!' অবিনাশ হাসেন।

রণিতা বলে, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জানতে চাইছি। যাঁরা

বায়না করেছেন, তাঁরা কিরকম দাম দিচ্ছেন? অবশ্য যদি আপত্তি থাকে—'

অবিনাশ বলেন, 'আপত্তির কিছু নেই। আমি কাঠায় চল্লিশ হাজার করে পাচ্ছি।'

জমিজমার দাম সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা নেই রণিতার। বিষয়-আশয় নিয়ে কোনোকালে সে মাথা ঘামায় নি। তবে এটুকু শুনেছে, এ অঞ্চলের জমি নাকি ইদানীং সোনার দরে বিকোচ্ছে। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো সে বলে, 'শুনেছি এখানকার জমি পার কাঠা এক লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।'

'তার থেকেও বেশি—দেড় লাখ।'

'আমরা আপনাকে ঠিক দাম দিতে চাই। জমিটা দয়া করে আমাদের দিন।'

অবিনাশ বলেন, 'আপনাদের তো বললাম, বায়না নেবার পর তা আর হয় না। তা ছাড়া বেশি টাকার আমার দরকার নেই। স্ত্রী মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে থাকে বাঙ্গালোরে, ছেলে আমেরিকায়। লস এঞ্জেলেসে ছেলে বিরাট বাড়ি করেছে, অঢেল রোজগার। সে আমাকে একা একা এখানে থাকতে দিতে চায় না। দু-চার মাসের ভেতর এসে আমাকে নিয়ে যাবে। তার আগে এখানকার জমিজমা বেচে দিতে চাই।' মানুষটি ভারি সরল, নইলে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা দুই অচেনা তরুণ তরুণীকে এভাবে জানাতেন না।

অবিনাশ আরো বলেন, 'যে বাড়িতে বসে আমরা কথা বলছি সেটা দেব আমার এক ভাইপোকে। তারপর একেবারে মুক্তপুরুষ হয়ে আমেরিকায় পাড়ি।'

রণিতারা তো আর জমি কিনতে আসে নি, নানা কথা বলে ঐ পাঁচ কাঠা জমির আসল রহস্য বার করে নিতে চায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'ঐ আঠারো নম্বরের জমিটা কারা কিনছেন?'

অবিনাশ একটু মজা করে বলেন, 'কেন, আপনারা কি তার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওটা নিতে চান?'

'না। এমনি কৌতূহল আর কি।'

'মমতা রায় নামে এক ভদ্রমহিলা মহৎ উদ্দেশ্যে ওটা কিনছেন, সেই জন্যে আমিও কম দামে রাজি হয়ে গেলাম। নইলে অনেক বেশি টাকার অফার এসেছিল।'

নয়নতারার নামে জমিটা বায়না হয় নি। আসল নামে তিনি তা হলে জমিটা কিনছেন? রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি মমতা রায়কে দেখেছেন?'

অবিনাশ বলেন, 'না। ওঁর লোক এসে বায়না করে গেছেন। তাঁকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া আছে। তিনি দু-এক সপ্তাহের ভেতর আলিপুরে জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে নেবেন।'

'মহৎ উদ্দেশ্যের কথা কী বলছিলেন?'

'মমতা রায় ঐ জমিটায় ডেস্টিটিউট মেয়েদের জন্যে একটা বড় হোম করতে চান।'

'ও। সত্যিই নোবল্ কজ।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে অবিনাশ তরফদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় চলে আসে রণিতারা। বিজন সেতুর দিকে হাঁটতে হাঁটতে অমিতেশ বলে, 'একটা ব্যাপার আমার গুলিয়ে যাচ্ছে রণি—'

রণিতা বলে, 'কী?'

'নয়নতারা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সেন্টার স্টেজে এতকাল ছিলেন, হঠাৎ তিনি সেখান থেকে মেয়েদের জন্যে বাড়ি করতে চাইছেন কেন?'

'সেটাই জানতে হবে। মানুষের চরিত্রে কত রকমের অ্যাঙ্গল যে থাকে!'

সতেরো

নয়নতারার বাড়ি থেকে সেদিন চলে আসার পর দু সপ্তাহ কেটে গেছে।

বর্ষা এবারের মতো বিদায় নিয়েছে। ঝকঝকে নীলাকাশে পেঁজা তুলোর মতো ধবধবে হালকা কিছু মেঘ আজকাল ভেসে বেড়ায়। যত দিন যাচ্ছে শরতের রোদে তত বেশি করে সোনালি আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

ইদানীং যতক্ষণ রণিতা বাড়িতে থাকে তার কান পড়ে থাকে টেলিফোনের দিকে। ইন্দ্রনাথের বিপুল উৎসাহ তাকে পুরোপুরি হতাশ হতে দেয় না। যদিও দুরাশা, তবু আবছাভাবে মনে হয়, হয়তো নয়নতারা শেষ পর্যন্ত মত পালটে তাকে ফোন করবেন।

এদিকে মায়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াইটা এখনও শেষ হয়নি, তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত হবেও না। তবে কিছুদিন হল সুধাময়ী মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, যদিও মুখটা সবসময় থমথমে হয়ে থাকে।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রোজই রণিতা সুধাময়ীকে বলে যায়, কেউ ফোন করলে যেন তার নামটা লিখে রাখেন। কিন্তু চোদ্দ দিন কেটে গেলেও নয়নতারার দিক থেকে কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই।

যখন নয়নতারা পর্বটা মাথা থেকে পুরোপুরি বার করে দিয়ে অন্য কোনো

সাবজেক্ট নিয়ে রণিতা ভাবতে শুরু করেছে সেই সময় একদিন সকালে নয়নতারার ফোন এল, 'আমি রণিতার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সেই সুরেলা, স্বপ্নগন্ধী কণ্ঠস্বর যা শ্রোতাদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটিয়ে দেয়। শিরদাঁড়া টান টান করে রণিতা বলে, 'আমিই রণিতা—'

'ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ, আপনি?'

'চমৎকার। ক'দিন ধরেই তোমার কথা ভাবছিলাম।'

রণিতা উত্তর দেয় না, এরপর নয়নতারা কী বলেন তা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

নয়নতারা বলেন, 'তুমি কি আমাদের বাড়ি একবার আসতে পারবে?'

রণিতা ভাবে, তিনি মত পালটেছেন কিনা জিজ্ঞেস করে কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় ওঁর কাছে গেলেই তো সব জানা যাবে। ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা যাক। বলে, 'নিশ্চয়ই পারব। কবে যেতে বলছেন?'

'কোনো জরুরি কাজ না থাকলে এখনই চলে এস না—'

'ঠিক আছে। ঘণ্টাখানেকের ভেতর পৌঁছে যাচ্ছি।'

'আর ঐ ইয়ংম্যানটি যে সারাক্ষণ তোমার গায়ে আঠার মতো জুড়ে থাকে, তাকেও এনো।'

রণিতা হাসে, 'আচ্ছা—'

নয়নতারা ফোন ছেড়ে দিতেই রণিতা অমিতেশকে তাদের বাড়িতে ডায়াল করে ধরে ফেলে, 'তোমার কাছাকাছি ঘড়ি আছে?'

অমিতেশ লেট-রাইজার, সাড়ে আটটার আগে কোনোদিন তার ঘুম ভাঙে না। জড়ানো গলায় বলে, 'আছে। কেন?'

কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল ঘুমের রেশ এখনও কাটে নি অমিতেশের। রণিতা বলে, 'ক'টা বাজে দেখ।'

'আটটা বেয়াল্লিশ।'

'আটাশ মিনিট সময় দিলাম। ঠিক ন'টা দশে মেট্রো রেলের কালিঘাট স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে—'

'ইয়ার্কি নাকি। এখনও আমার মুখটুখ ধোওয়া হয়নি, শেভ করিনি. এত তাড়াতাড়ি—'

'কোনো কথা শুনতে চাই না। যা বললাম তাই করবে। শার্প অ্যাট টেন মিনিটস পাস্ট নাইন—'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'দেখা হলে বলব।' রণিতা লাইন কেটে দেয়।

ন'টা পঁচিশে রণিতা আর অমিতেশ চোদ্দ নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের দোতলার হল-ঘরে যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, নয়নতারা একটা সোফায় বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'বসো।' রণিতারা বসলে বলেন, 'খুব অবাক হয়ে গেছ, না?'

রণিতা বলে, 'তা একটু হয়েছি। ভাবতে পারি নি, আপনি ফোন করবেন।

'বিশেষ দরকারে ফোনটা করতে হল।' নয়নতারা বলেন, 'আগেই করতাম। ভেবে দেখলাম, ক'টা দিন তোমাদের ওপর নজর রাখি।'

তাঁর কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না রণিতার। বলে, 'আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি কিনা, সেটা দেখতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ। সেনসেসন ক্রিয়েট করতে তোমরা যে আমার কথা কাগজে বার করে দাও নি, সে জন্যে খুব খুশি হয়েছি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা বলেন, 'তোমরা সেদিন চলে যাবার পব তোমাদের প্রোপোজালটা নিয়ে অনেক বার ভেবেছি।'

রণিতারা উন্মুখ হয়ে ছিল। বলে, 'কী ভাবলেন?'

নয়নতারা বলেন, 'আর্টিস্ট হিসেবে, বিশেষ করে একজন মানুষ হিসেবে আমার অনেক কিছু বলার আছে। সেই জন্যে তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজি।'

সমস্ত শরীরে যেন শিহরন খেলে যায় রণিতার। গাঢ় আবেগের গলায় বলে, 'আপনাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব বুঝতে পারছি না। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন এবার সার্থক হবে।'

নয়নতারা বলেন, 'আমার কথা কিন্তু শেষ হয় নি।'

রণিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। তার মনে সংশয়ের একটু ছায়া পড়ে।

নয়নতারা বলেন, 'আমার কিছু শর্ত আছে।'

রণিতা বলে, 'কী শর্ত?'

'ডকু-ফিচারটা করতে হবে গোপনে। কেউ জানুক সেটা আমি একেবারেই চাই না।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'অসুবিধেটা কোথায়?'

রণিতা বলে, 'দূরদর্শন এটা কমিশন করছে, তারা টাকা দেবে। ওদের তো জানাতেই হবে।'

'ওদের টাকা নিতে হবে না।'

অবাক হয়ে রণিতা বলে, 'না নিলে ছবিটা করব কী করে? আমার কি টাকা আছে?'

নয়নতারা বলেন, 'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, আস্তে আস্তে ছবিটা কর। শুরু করার জন্যে যা দরকার আমি তার ব্যবস্থা করব। ভিডিও করতে চাও, না ফিল্মে?'

'ফিল্ম করারই ইচ্ছে।'

'তা হলে ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্টও চাই। তারা আবার বাইরে আমার কথা জানিয়ে দেবে না তো?'

'আমার টিমে যারা কাজ করে তারা খুবই ট্রাস্টওয়ার্দি, তারা এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করবে না। কিন্তু—'

'কী?'

'ডকু-ফিচারটা করতে অনেক টাকা লাগবে—' বলতে বলতে চুপ করে যায় রণিতা।

নয়নতারা তার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন। বলেন, 'আরম্ভ তো কর, তারপর দেখা যাক।'

পুরো টাকাটা নয়নতারা জোগাড় করে দিতে পারবেন কিনা, রণিতার কাছে তা পরিষ্কার হয় না। কিন্তু এ নিয়ে প্রশ্ন করলে যদি বিরক্ত হয়ে গোটা প্রোপোজালটা নাকচ করে দেন তাহলে তো আর আশাই নেই। রণিতা বলে, 'আপনি যা বলবেন, তাই হবে।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'ছবিটা হয়ে যাবার পর আমাকে না জানিয়ে কাউকে দেখাতে পারবে না। রাজি?'

'রাজি।'

'তা হলে নেক্সট উইক থেকে কাজ শুরু করতে পার।'

'নেক্সট উইকে পারব না।'

'কেন?'

রণিতা জানায়, নয়নতারা সম্পর্কে তারা যেটুকু জেনেছে তার সবটাই কাগজপত্র পড়ে এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, থিয়েটার ওয়ার্ল্ডের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে।

অবশ্য নয়নতারার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে তেমন কিছু জোগাড় করা যায় নি। কিন্তু সে সবের ওপর নির্ভর করে, একটা নিখুঁত বিশ্বাসযোগ্য জীবনীচিত্র তৈরি করা যায় না। বিদ্বেষের কারণে অনেকে নয়নতারা সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করেছে, আবার প্রবল উচ্ছ্বাসে অন্ধ অনুরাগীরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাঁর অলৌকিক এক ইমেজ তৈরি করে চোখ কান ধাঁধিয়ে দিয়েছে। সেটা নয়নতারার জীবনের একটা বড় দিক নিঃসন্দেহে, কিন্তু এর বাইরেও তাঁর ব্যক্তিগত একটা জীবনও রয়েছে তা একান্তভাবেই তার নিজস্ব। সেখানে মিডিয়া এখনও পৌঁছুতে পারে নি।

গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের মানুষ, বিশেষ করে চিত্রতারকারা দু'ধরনের হয়ে থাকে। হয় তারা দারুণ খোলামেলা, এদের গোপন বলতে কিছু নেই। আবার কেউ কেউ আছে যারা নিজের সম্বন্ধে খানিকটা জানিয়ে বেশির ভাগটাই রহস্যের মোড়কে ঢেকে রাখে। এরা হয়তো মনে করে এই গোপনতা তাদের সম্পর্কে লোকের কৌতূহল অনেক বাড়িয়ে দেবে। মিড়িয়া এদের পেছনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। নয়নতারা কিন্তু এই দু'দলের কোনোটাতেই পড়েন না। স্টেজ বা স্ক্রিন কেরিয়ার নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ নেই। মিডিয়াকে হাজার মাইল দূরে সরিয়ে একেবারে নিজের মতো করে জীবনযাপন করতে চান। কোনো গ্ল্যামার বা রহস্যসৃষ্টির জন্য নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে।

অন্য চিত্রতারকারা টাকা, নাম, গ্ল্যামার, এসব নিয়েই খুশি। কিন্তু তাদের থেকে আলাদা নয়নতারা, নইলে গ্ল্যামারের সেন্টার স্টেজে থাকতে থাকতে কেউ এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়?

মিডিয়া যে মিথ তৈরি করে রেখেছে তার বাইরেও অন্য এক নয়নতারা আছেন যিনি গ্ল্যামারের মধ্যে জীবন কাটাতে চান না। স্টেজ এবং স্ক্রিনের বাইরে কোন ভূমিকা তিনি পালন করছেন সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে এই দুই নয়নতারাকে মেলাতে পারলে তবেই তাব ডকু-ফিচারটা জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এ সব জানিয়ে রণিতা নয়নতারাকে বলে, 'এর জন্যে বেশ কিছুদিন কাছে কাছে থেকে আপনাকে অবজার্ভ করা দরকার।'

চোখ কুঁচকে কয়েক পলক রণিতাকে লক্ষ করেন নয়নতারা। তারপর বলেন, 'সেটা কী করে সম্ভব? তুমি থাকো ওল্ড বালিগঞ্জে, আমি ওল্ড আলিপুরে। চার মাইল দূরে থেকে অবজার্ভ করবে কী করে?'

'আপনি একটু ভাবুন—'

'ভাবাভাবির কী আছে। কাছে থেকে অবজার্ভ করতে হলে তো তোমাদের এখানে এসে থাকতে হয়—'

'আমারও তাই মনে হয়।'

নয়নতারা ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলেন, 'তুমি অতি ধুরন্ধর ছুকরি, সাঙ্ঘাতিক ফন্দিবাজ। আমার মুখ দিয়ে নিজের মতলবের কথাটা ঠিক বার করে নিলে।'

রণিতা হাসতে থাকে।

নয়নতারা জিজ্ঞেস করেন, 'কতদিন আমার বুকের ওপর চেপে বসে থাকতে চাও?'

রণিতা বলে, 'যতদিন না আপনাকে পুরোপুরি জানতে পারছি।'

একটু চুপচাপ।

এবার রণিতা বলে, 'আমরা সকালে চলে আসব, সন্ধের পর ফিরে যাব। রাত্তিরে থাকব না।'

নয়নতারা অবাক হবার ভান করেন, 'সে কী!'

তাঁর বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে না পেরে রণিতা বিমূঢ়ের মতো তাকায়।

নয়নতারা ঝপ করে গলা নামিয়ে চাপা ফিসফিসানির মতো বলে, 'রাত্তিরে না থাকলে কেলেঙ্কারি টেলেঙ্কারি করছি কিনা জানবে কী করে?'

রণিতার মতো স্মার্ট ঝকঝকে মেয়েও কেমন যেন হকচকিয়ে যায়, কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

নয়নতারা থামেন নি, 'এইসব কেলেঙ্কারি টেলেঙ্কারি যদি ভাল করে ইউজ করতে পার তোমার ডকু-ফিচারটা কিন্তু দুর্দান্ত জমে যাবে।'

রণিতা বুঝতে পারছিল নয়নতারা মজা করছেন। সে সসম্ভ্রমে বলে, 'আপনি ওসব করেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

কৌতুকে নয়নতারার ভুরু অল্প অল্প নাচতে থাকে। তিনি বলেন, 'আমার বয়েস ষাট হয়েছে বলে? জানো না আমার নামে চারদিকে কত স্ক্যান্ডাল। আট বছর আগে ফিল্ম টিল্ম ছেড়ে চলে এসেছি, স্ক্যান্ডালটা কিন্তু আমার পিছু ছাড়ে নি, সুযোগ পেলে কেউ না কেউ এখনও আমার নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়।'

'যে যা খুশি করুক, স্ক্যান্ডাল নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না।

তারপর নয়নতারা শুরু করেন, 'বেশ, সকালে এসে সারাদিন থেকে চলে যেও। একজন নির্বাপিত চিত্রতারকা যে এখন আর কিছুই করে না, সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, তার কাছে থাকতে থাকতে 'বোর' হয়ে যাবে।'

হাসিমুখে রণিতা বলে, 'দেখা যাক।'

'কবে থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে চাও?'

'আপনি যেদিন থেকে বলবেন।'

নয়নতারা বলেন, 'জ্বালাতন যখন করবেই তখন আর দেরি করে কী হবে। কাল থেকেই শুরু করে দাও।'

রণিতা বলে, 'থ্যাঙ্ক য়ু ম্যাডাম।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে ক'টা ফোন আসে। সবাইকেই ওপার বাংলার ডায়লেক্টে সেই সেদিনের মতো নয়নতারা জানিয়ে দেন, 'মেমসাব বাড়িতে নাই। কহন তেনারে পাইবেন, কইতে পারুম না। নমস্কার—পন্নাম— আইচ্ছা রাখি।'

ফোনের কথোপকথন শেষ হলে নয়নতারা রণিতাকে বলেন, 'তোমাদের যে এই বাড়িতে ঢুকে ডকু-ফিচারটা করতে দিচ্ছি তাতে আমার কিছু স্বার্থ আছে। আমার একটা কাজ হয়তো তোমাদের করে দিতে হবে।'

রণিতা উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী স্বার্থ? কী কাজ?'

'এক্ষুনি সেটা বলছি না।' নয়নতারা বলেন, 'কিছুদিন তোমাদের দেখি, তারপর বলব।'

হালকা গলায় রণিতা বলে, 'আমাদের যাচাই করে নিতে চান?'

'যা বলেছ।' নয়নতারাও হাসেন।

আঠারো

পরদিন বেশ সকালেই অমিতেশ আর রণিতা টেপ রেকর্ডার, নোট বুক পেন, নানা রঙের টিউব, তুলি, একটা স্টিল ক্যামেরা ব্যাগে পুরে চলে আসে রণিতার আঁকার হাত চমৎকার, যদিও আর্ট স্কুলে কোর্স করে ডিগ্রি বা ডিপ্লোম নেয় নি। তাকে মোটামুটি স্বয়ংশিক্ষিত বলা যায়, নিজের চেষ্টাতেই যা শেখার সে শিখেছে।

চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় তার মডেল। তাঁর মতোই নানা দৃশ্যের ছোট ছোট স্কেচ সে আগেই এঁকে নেয়। নয়নতারাকে নিয়ে যে ডকু-ফিচারটার পরিকল্পনা রণিতা করেছে তার স্ক্রিন-প্লে লেখার সময় এখনও আসে নি, তবু তাঁর নানা মুডের বেশ কিছু ছবি এঁকে রাখবে রণিতা, পরে এগুলোকে

চলমান দৃশ্যমালার ফাঁকে ফাঁকে ব্যবহার করবে। রঙিন এই স্কেচগুলো ডকু-ফিচারটির আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দেবে।

এখানে আপাতত তাদের একমাত্র কাজ হবে নয়নতারাকে সারাদিন অনুসরণ করে যাওয়া, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কিভাবে কাটান তা লক্ষ করা। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে কথা বলে নানা তথ্য জেনে নেওয়া এবং যে সব উপকরণ এতদিন ধরে জোগাড় করেছে সেগুলো কতটা সত্যি আর কতটা রটনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা।

আটটার আগেই এ বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল রণিতারা। এর মধ্যে স্নান শেষ নয়নতারার। হালকা গোলাপি রঙের মিহি টাঙ্গাইল শাড়ি আর ঐ রঙেরই ব্লাউজ তাঁর পরনে। শ্যাম্পু-করা ফাঁপানো চুল পিঠময় ছড়ানো, চোখে সরু করে কাজলের টান, কপালে ম্যাজেন্টা রঙের গোল টিপ।

দোতলার বড় হল-ঘরে রণিতাদের বসিয়ে নয়নতারা বলেন, 'কাজ শুরুর আগে ব্রেকফাস্টটা করে নাও।'

রণিতা বিব্রতভাবে বলে, 'আমরা খেয়ে এসেছি।'

নয়নতারার চোখমুখ দেখে মনে হল, বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বললেন, 'কাল থেকে খেয়ে এলে কিন্তু চলবে না। সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, বিকেলে স্ন্যাকস—সব এখানে, বুঝলে?'

রণিতারা ঠিক করে রেখেছিল ব্রেকফাস্ট সেরে সকালে তারা এখানে আসবে, দুপুরে এক ফাঁকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে লাঞ্চটা খেয়ে আসবে। বিকেলে বিশেষ খাওয়া টাওয়ার অভ্যাস নেই তাদের। এ বাড়িতে তখন একটু চা পাওয়া গেলে ভাল, না পেলেও অসুবিধা নেই। সব রকম পরিস্থিতিতেই তারা অভ্যস্ত। মধ্যপ্রদেশের দুর্গম অঞ্চলে কিংবা আসামের মিকির পাহাড়ে ডকুমেন্টারি ছবি তুলতে গিয়ে বহুদিন তাদের খাওয়া জোটেনি। এসব নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামায় না। রণিতাদের কাছে কাজটাই আসল।

আতিথেয়তার ব্যাপারে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে নয়নতারার দারুণ মিল। খাওয়া নিয়ে আপত্তি করলে যদি এ বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায় সেই ভয়ে রণিতা বলে, 'ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

নয়নতারা খুশি হন, 'গুড।' একটু থেমে আবার বলেন, 'তোমাদের আসতে কিন্তু বেশ দেরি হয়ে গেছে। আমার দিন শুরু হয় ভোর সাড়ে পাঁচটায়। তখন একজন ইনস্ট্রাক্টর এসে আমাকে চল্লিশ মিনিট নানা রকম যোগাসন করিয়ে দিয়ে যায়। সেটা কিন্তু তোমাদের দেখা হল না।'

'আরেক দিন দেখে নেব।'

'অত ভোরে কি এখানে পৌঁছুতে পারবে? দেখতে হলে আগের দিন রাত্তিরে এ বাড়িতে থেকে যেতে হয়।'

'আপনি অনুমতি দিলে থাকব।'

'ঠিক আছে, যেদিন ইচ্ছে থেকো।'

'একটা মুভি ক্যামেরা নিয়ে আসব কিন্তু।'

'আসনের ছবিগুলো তুলে রাখবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'রেখো।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ হল-ঘরের ওয়াল ক্লকটার দিকে চোখ যেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নয়নতারা, 'আমাকে এবার উঠতে হবে। মেটিরিয়ালের খোঁজে তোমরা এ বাড়ির যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। কাজের লোকেদের বলা আছে, কেউ বাধা দেবে না। চা খেতে ইচ্ছে হলে ওদের বলো, দিয়ে যাবে।' বলতে বলতে উঠে পড়েন তিনি।

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'আবার কখন দেখা হবে আপনার সঙ্গে?'

'দু'ঘণ্টা পর।'

'আপনি কি বাইরে কোথাও যাবেন?'

'না, বাড়িতেই থাকব।'

রণিতাদের আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে নয়নতারা বাঁ দিকের একটা ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যান।

তারপরও বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে রণিতা আর অমিতেশ। নয়নতারা ওভাবে চলে যাওয়ায় তারা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

একসময় অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'হঠাৎ উনি চলে গেলেন কেন?'

রণিতা বলে, 'কী করে বলব? হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে। একটু ভেবে বলে, 'বসে থেকে লাভ নেই। চল, বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখা যাক। কোন কোন স্পট থেক শুটিং করব সেগুলো ঠিক করে রাখি।'

'সেই ভাল।'

এ বাড়ির যেখানে খুশি যাবার জন্য ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন নয়নতারা। রণিতারা দোতলার ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। এখানে পাঁচটা বেড-রুম। সবগুলোই চমৎকার সাজানো গোছানো। হল-এর মতো শোবার ঘরের দেওয়ালেও নাম-করা শিল্পীদের অসংখ্য চোখ-জুড়নো পেইন্টিং।

একটা ব্যাপার লক্ষ করল রণিতা, এত বড় বাড়িতে নিজের একটি ছবিও নেই। এমনকি যে শ' দেড়েক ফিল্ম আর নাটকে তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার একটি স্টিলও দেখা গেল না।

অমিতেশও তা লক্ষ করেছিল। সে বলে, 'কী ব্যাপার বল তো, নয়নতারার কোনো ছবি চোখে পড়ল না! নিজের সম্বন্ধে এত উদাসীনতা কেন ভদ্র মহিলার?'

রণিতা বলে, 'কী জানি। অন্য স্টাররা শুনেছি তাদের সারা বাড়ি নিজের ছবি দিয়ে বোঝাই করে রাখে। সেদিক থেকে নয়নতারা একটি মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার।'

দোতলা থেকে খানিক বাদে ওরা ছাদে চলে আসে। এখানে যেদিকেই তাকানো যাক, পলিথিনের পুরু শিটের ওপর দেড় ফুট মাটি বসিয়ে তার ওপর দারুণ একখানা রুফ গার্ডেন বানানো হয়েছে। মাঝখানে সবুজ কার্পেটের মতো খানিকটা ঘাসের জমিকে ঘিরে ছোট বড় অসংখ্য টবে পাতাবাহার, ঝাউ থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফুল আর ফলের গাছ। একটা প্রকাণ্ড টবে অজস্র পাতিলেবু ফলে আছে, আরেকটায় গোল গোল পেয়ারা।

নয়নতারা যে গাছপালা ভালবাসেন সেটা এ বাড়িতে পা দিলেই টের পাওয়া যায়। সামনের দিকের খোলা বাগানে, একতলার সারি সারি পেতলের টবে আর এই রুফ গার্ডেনে শুধু গাছ আর গাছ।

মুগ্ধ চোখে রুফ গার্ডেনটা দেখছিল রণিতারা। হঠাৎ স্তোত্রপাঠের মতো কিছু কানে আসতে এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। ছাদের পুব দিকের শেষ মাথায় একটা বেশ বড় ঘর চোখে পড়ে তাদের, সেখান থেকে কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসছে।

রণিতা আর অমিতেশ পরস্পরের দিকে একবার তাকায়। তারপর নিঃশব্দে ঘরটার কাছে চলে আসে।

দরজা বন্ধ রয়েছে, তবে ডানপাশের জানালাটা খোলা। পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় রণিতারা। উঁকি দিতে চোখে পড়ে একটা উঁচু বেদির ওপর পশমের পুরু আসনের ওপর পা মুড়ে বসে আছেন নয়নতারা। চোখ দুটি বোজা, মেরুদণ্ড টান টান, হাত দু'টি হাঁটুর ওপর ন্যস্ত। একেবারে ধ্যানস্থ চেহারা। সামনে কোনো দেবদেবীর মূর্তি নেই।

তন্ময় হয়ে নয়নতারা কিছু আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন, হয়তো কোনো ধর্মগ্রন্থের শ্লোক। তাঁর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য সুরেলা, শোনাচ্ছিল অনেকটা গানের মতো। এই মুহূর্তে নয়নতারাকে ভারি পবিত্র মনে হচ্ছিল। ভারতীয় সিনেমার গ্ল্যামার কুইনকে এমন এক চেহারায় দেখা যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! মুগ্ধ চোখে পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে রণিতা।

অমিতেশ পাশ থেকে নিচু গলায় বলে, 'ভদ্রমহিলা যে এমন রিলিজিয়াস মাইন্ডেড সেটা এ বাড়িতে না এলে জানাই যেত না।'

রণিতা অস্পষ্টভাবে কী উত্তর দেয়, বোঝা যায় না।

খানিকক্ষণ পরে দু'জনে দোতলার হল-ঘরে নেমে এসে সোফায় বসে পড়ে।

অমিতেশ বলে, 'এখন এক কাপ চা পেলে খুব ভাল হত।'

রণিতা বলে, 'নয়নতারা তো বলেই দিয়েছেন, আমাদের যা দরকার কাজের লোকেদের জানালেই পেয়ে যাবে।'

'আশে পাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। নিচে গিয়ে—'

অমিতেশের কথা শেষ হবার আগেই ডান ধারের ঘরটা থেকে একটি মাঝবয়সী লোক হল-ঘরে এসে ঢোকে। একে আগেও দেখেছে অমিতেশরা, নাম হারাধন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে রোজ সারা বাড়ির ধুলোবালি পরিষ্কার করা খুব সম্ভব তার আসল কাজ। অন্তত দেখে শুনে সেটাই মনে হয়েছে অমিতেশদের।

রণিতা বলে, 'আমাদের একটু চা খাওয়াতে পার হারাধনদা?'

হারাধন সসম্ভ্রমে বলে, 'আমি এক্ষুনি সন্ধ্যাদিদিকে গিয়ে বলছি।' বলে শশব্যস্তে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে সেই মহিলাটি ট্রেতে টি-পট, সুগার কিউব, মিল্কপট এবং বোন চায়নার কাপ টাপ সাজিয়ে এনে রণিতাদের সামনে সেন্টার টেবিলে রাখে। বাড়িতে প্রথম যেদিন রণিতা আসে, তার জন্য এই মহিলাই ট্রলিতে করে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছিল। এর নাম যে সন্ধ্যা সেটা অবশ্য জানা ছিল না।

সন্ধ্যা দাঁড়ায় না, ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যায়। হয়তো ভেতরে তার কোনো জরুরি কাজ আছে।

ধীরেসুস্থে চা তৈরি করে একটা কাপ অমিতেশকে দিয়ে নিজে এক কাপ নেয় রণিতা। সবে ওরা চায়ে চুমুক দিয়েছে, নয়নতারা হল-ঘরে চলে আসেন। খুব সম্ভব সোজা ছাদ থেকেই আসছেন তিনি। ওঁকে দেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রণিতারা, নয়নতারা বলেন, 'বস, বস।' নিজেও ওদের পাশে বসতে বসতে বলেন, 'এত বেলায় চা খাচ্ছ! লাঞ্চের সময় কিন্তু হয়ে গেছে।'

অমিতেশ বলে, 'চা'টা আমরা একটু বেশিই খাই। আমাদের কাছে এনি টাইম ইজ টি টাইম।'

নয়নতারা এ নিয়ে আর কিছু বলেন না।

একটু চুপচাপ।

তারপর রণিতা বলে, 'আজ একজন বিখ্যাত মানুষকে আমরা নতুন করে

আবিষ্কার করেছি।' সাজানো গোছানো বইয়ের ভাষাতেই কথাগুলো বলল সে।

নয়নতারা কিছু একটা অনুমান করে উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করেন, 'কাকে আবিষ্কার করলে?'

রণিতা বলে, 'আপনাকে। ধর্মের ব্যাপারে আপনার যে এতটা নিষ্ঠা, আগে আমাদের ধারণা ছিল না।'

নয়নতারা চোখ সরু করে সকৌতুকে রণিতাকে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'বুঝেছি। তোমরা নিশ্চয়ই ছাদে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে রণিতা।

'আসলে ধর্ম কিনা জানি না, আমার ঠাকুরদা ছেলেবেলায় গীতা, চণ্ডী, ব্যাসদেবের মহাভারত আর বেদ-উপনিষদের অসংখ্য শ্লোক আমাকে মুখস্থ করিয়েছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন রোজ সকালে একঘণ্টা করে শ্লোকপাঠ করতে হত। তিনি মারা যাবার পরও অভ্যাসটা গেল না। ওটা কেমন যেন নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল। পরে আমার বিয়ে হল, তারপর দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। বেঁচে থাকার জন্যে অভিনয় শুরু করলাম। তিরিশ বত্রিশটা বছর সিনেমা আর স্টেজে কী প্রচণ্ড ব্যস্ততার ভেতরেই না কেটে গেল কিন্তু তার মধ্যেও সময় করে শ্লোকপাঠটা চালিয়ে যেতে লাগলাম। আর এখন তো রিটায়ার্ড লাইফ। হাতে অনন্ত সময়। আগে এক ঘণ্টা শ্লোকপাঠ করতাম, আজকাল সেটা বাড়িয়ে করেছি দু'ঘণ্টা।' একটানা বলতে বলতে একটু থামেন নয়নতারা। তারপর ধীরে ধীরে ফের শুরু করেন, 'এর সঙ্গে ধর্মের যোগ কতটা, বলতে পারব না। তবে আমার খুব ভাল লাগে। কী যে আনন্দ পাই, বোঝানো যাবে না। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটা সবরকম গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই সময়টা আমার মনে হয়, বিরাট কিছু পেয়ে গেলাম।'

রণিতারা লক্ষ করল, নয়নতারার সারা মুখে আশ্চর্য প্রশান্তি। তাঁর দুই চোখ অপার্থিব কোমল আলোয় ভরে গেছে।

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না।

এদিকে রণিতাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। একসময় নয়নতারা বলেন, 'চল এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

এ বাড়ির একতলা এবং দোতলা, দু'জায়গাতেই ডাইনিং হল রয়েছে। নয়নতারা রণিতাদের সঙ্গে করে একতলায় চলে আসেন।

খাবার ঘরের পাশেই কিচেন। সেখানে বয়স্ক রান্নার লোক ছাড়া সন্ধ্যা এবং আরেকটি কম বয়সের মেয়ে যার নাম মালতী, অপেক্ষা করছিল।

নয়নতারা বলেন, 'বসো।'

বড় রেক্ট্যাঙ্গুলার টেবিলের একদিকে বসেন নয়নতারা, তাঁর মুখোমুখি রণিতা আর অমিতেশ।

সন্ধ্যারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। রণিতারা বসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট টেবল ম্যাট, চামচ, ফর্ক, ন্যাপকিন ইত্যাদি সাজিয়ে খাবার দিতে শুরু করল। প্রথমে এল ভেজিটেবল সুপ। তারপর রণিতা এবং অমিতেশের জন্য ধবধবে সরু চালের ভাত, ঘি, নারকেল দিয়ে মুগের ডাল, আলু ও বড়ি ভাজা, কপির ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, টমাটোর চাটনি এবং ঘরে·পাতা ঘন দুধের দই। নয়নতারা ভাত খান না, তাঁর জন্য এল সাদা গমের ছোট ছোট তিনখানা রুটি, সুপ, এক প্লেট সবজি সেদ্ধ, দু টুকরো মাছ, এক বাটি ডাল আর টক দই।

খেতে খেতে হঠাৎ রণিতার চোখে পড়ে, কিচেনের দেওয়ালে নয়নতারার তিনটি ফিল্মের তিনটে স্টিল ফটো এনলার্জ করে টাঙানো রয়েছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা বলব?'

নয়নতারা বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

'গোটা বাড়িতে আপনার কোনো ছবি নেই। দেড়শ'রও বেশি ফিল্ম আর নাটকে অভিনয় করেছেন। তার বেশির ভাগই সুপার ডুপার হিট। কিন্তু সে সব বাদ দিয়ে বক্স অফিসে মোটামুটি সাকসেস হয়েছে এমন তিনটে ছবির স্টিল টাঙিয়ে রেখেছেন, তাও কিনা কিচেনের ওয়ালে!'

নয়নতারা উত্তর দেন না, সামান্য হাসেন।

রণিতা বলে, 'আমার খুব আশ্চর্য লাগছে, আপনার এত পপুলার ছবি থাকতে শুধু এই তিনটে ফিল্মের স্টিল কেন?'

নয়নতারা স্থির চোখে রণিতার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমিই বল না—'

এবার খুব ভাল করে স্টিলগুলো লক্ষ করতে থাকে রণিতা। জনপ্রিয় ছবি বা নাটককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মাঝারি ধরনের সফল তিনটি ছবির স্টিল সযত্নে টাঙিয়ে রাখার মধ্যে কী মনোভাব কাজ করতে পারে?

স্টিল তিনটি যে ছবিগুলোর তা হল 'নিবেদিতা', 'ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ' এবং 'রানী রাসমণি'। তিন মহীয়সী মহিলার জীবনী নিয়ে ফিল্মগুলো বিশ-পঁচিশ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। বিদ্যুৎচমকের মতো রণিতার মনে হল, জাতির জীবনে যে তিন অসামান্যা নারী· বিরাট ভূমিকা পালন করে গেছেন, তাঁদের চরিত্রে অভিনয় করে নয়নতারা সবচেয়ে তৃপ্ত। ছবি তিনটি রণিতা দেখেছে, তার মনে

হয়েছিল প্রাণ ঢেলে চরিত্রগুলি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার মানে, অনবরত রোমন্টিক ছবির নায়িকা হয়ে যে গণ্ডা গণ্ডা ছবিতে তিনি অলীক স্বপ্ন বিকিরণ করে গেছেন সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। নেহাত পয়সার জন্য নানা মালমশলা দিয়ে তৈরি এই ছবিগুলো তিনি করে গেছেন। যে ছবিতে সামাজিক তাৎপর্য বা দেশকাল সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা না থাকে সে ছবি তার কাছে মূল্যহীন।

রণিতা স্টিলগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'একটু বোধ হয় বুঝতে পেরেছি।'

হাসিমুখে, বুঝিবা একটু মজার সুরেই নয়নতারা বলেন, 'শুনি, কী বুঝেছ—'

স্টিল তিনটে দেখতে দেখতে খানিক আগে রণিতার যা মনে হয়েছিল, আস্তে আস্তে বলে যায় রণিতা।

শুনতে শুনতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন নয়নতারা। তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে কিছুক্ষণ আগের মজার ভাবটা দ্রুত মুছে যায়। বেশ জোর দিয়েই বলেন, 'দ্যাটস লাইক আ ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট গার্ল। তুমি ঠিকই ধরেছ, যে ছবি বা নাটকে সোসাল অ্যাসপেক্ট নেই বা দেশ আর মানুষ সম্পর্কে যার মধ্যে কোনোরকম কমিটমেন্ট নেই তা আমার ভাল লাগে না। নায়কের বুকে মুখ বা মাথা রেখে, কী তাকে মুহুর্মুহু জড়িয়ে ধরে, তার গালে নাক ঘষে দিনের পর দিন পর্দায় সফট পর্নো তৈরি করে কিছু পয়সা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, আ রিয়াল হিউম্যান বিয়িং, এটাই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?'

নয়নতারাকে যেন এবার অল্প অল্প বোঝা যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাসিনের কারণটাও। রণিতা জিজ্ঞেস করে 'এই জন্যেই কি সব ছেড়ে একদিন অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিলেন?'

আজ খুব একটা ভাল মুডে আছেন নয়নতারা। যে কথা আট বছর ধরে কখনও প্রকাশ করেন নি, ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে নি তাঁর আকস্মিক গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ত্যাগের কারণ, দু'টি ঝকমকে, শ্রদ্ধাশীল তরুণ-তরুণীকে সামনে পেয়ে তা বলার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

নয়নতারা বলেন, 'তা বলতে পার। তবে অন্য কিছু কারণও আছে। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।' একটু থেমে ফের বলেন, 'আসল ব্যাপারটা কী জানো, ঐ সব কমার্শিয়াল ছবিতে কাজ করতে করতে আমি টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিটি ছবিতে প্রায় এক ধরনের ক্যারেক্টার, একই রকম ডায়লগ,

একই টাইপের সিচুয়েশন। বাচ্চারা শ্লেটের ওপর যেমন দিনের পর দিন দাগা বুলিয়ে যায়, অনেকটা সেই রকম। কিংবা বলতে পার একটা ছবি আরেকটার প্রায় জেরক্স কপি। এসব তো ছিলই, সেই সঙ্গে একটা প্রশ্ন বার বার আমাকে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল।'

জিজ্ঞাসু সুরে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী সেটা?'

'স্টোরি রাইটার ক্যারেক্টার তৈরি করত—কোনো ছবিতে তার নাম শ্যামলী, কোনো ছবিতে বিশাখা, কোনোটায় সুপর্ণা বা মীনাক্ষী। ছবিতে নেমে আমি কখনও শ্যামলী, কখনও বিশাখা ইত্যাদি হয়ে গেলাম। ডায়ালগ রাইটাররা সংলাপ লিখে দিল, আমি গড়গড় সেগুলো আউড়ে গেলাম। ডিরেক্টর যেভাবে হাত-পা নাড়তে বলল, যেভাবে হাসতে বা লাফাতে ঝাঁপাতে বলল, হুবহু তাই করতে লাগলাম। স্বপ্নের সওদাগরেরা আমাকে স্ক্রিনের ড্রিম গার্ল বানিয়ে দিল। মিডিয়ার লোকেরা আমাকে নিয়ে হাজারটা মিথ তৈরি করে ফেলল। এমনকি আমার আসল নামটা পালটে নয়নতারা রাখা হল। ঠিক আছে, ধরা যাক, নামে না হয় কিছু আসে যায় না। কিন্তু—'

রণিতারা কিছু বলে না, শুধু উন্মুখ তাকিয়ে থাকে।

নয়নতারা থামেন নি, 'আমর মনে হল, চিরকাল সুপর্ণা, বিশাখা, শ্যামলী হয়েই কাটিয়ে দেব? মিডিয়া আমার যে ইমেজ তৈরি করে দিয়েছে তার বাইরে কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারব না? অন্যের হুকুমে নেচে গেয়ে আর ডায়ালগ বলেই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে?' নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে বলেন, 'আমার মধ্যে যে লক্ষ্মী বা মমতা রয়েছে তার কি কিছুই করণীয় নেই? তাই একদিন সব ফেলে নির্বাসনে চলে গেলাম। কিন্তু —'

'কিন্তু কী?'

'মিডিয়ার তৈরি মিথ আর ইমেজ আমার পিছু ছাড়ল না। ওরা আমার গায়ে এমন একটা স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে যে রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব। আট বছর আমি গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে নেই, তবু পুরনো ইমেজ আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সত্যি বলছি আমি এর হাত থেকে মুক্তি চাই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রণিতা বলে, 'আপনি তো নিজের মতো কিছু করার জন্যে নাটক আর ফিল্ম ছেড়েছিলেন। এই আট বছর কী করলেন?'

নয়নতারা বলেন, 'সেটা বলার মতো নয়। তবে অনেক কিছুই করার ইচ্ছা।'

'যেমন?'

'তোমরা তো এখন থেকে রেগুলার আসছ। চোখ কান খোলা রাখলে নিজেরাই জানতে পারবে।'

রণিতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'কসবায় যে জমিটা কিনতে যাচ্ছেন সেটা দিয়ে কী করতে চান?' যদিও জমির মালিকের সঙ্গে সেদিন কথা বলে তারা জেনে এসেছে মহৎ উদ্দেশ্যেই ওটা কেনা হচ্ছে, তবু প্রশ্নটা করল সে।

নয়নতারা চমকে ওঠেন, 'তোমরা জানলে কী করে?' পরক্ষণে হেসে ফেলেন, 'ও বুঝেছি। সেদিন একজনের সঙ্গে ফোনে জমিটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তোমরা কাছে বসে ছিলে। তা কসবা পর্যন্ত ও তোমরা পৌঁছে গেছ? কী বিচ্ছু ছেলেমেয়ে!'

অমিতেশ নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিল। এবার সে বলে, 'আমাদের সময়ের একজন লিজেন্ডারি আর্টিস্টকে নিয়ে ছবি করতে যাচ্ছি। তাঁর জীবনের সব দিক জানতে না পারলে ছবিটায় অনেক ফাঁক থেকে যাবে যে। কসবার খবরটা পেয়েই তাই ছুটে যেতে হল।'

নয়নতারার কপাল সামান্য কুঁচকে যায়। তবে তিনি যে এই গোয়েন্দাগিরির জন্য বিরক্ত হন নি সেটা তাঁর মুখ দেখে টের পাওয়া গেল। হাল ছেড়ে দেবার মতো কপট একটা ভঙ্গি করে বলেন, 'তোমাদের নিয়ে আর পারা যায় না।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'ঐ জমিটা নিয়ে দারুণ কিছু একটা করার পরিকল্পনা নিয়েছেন নিশ্চয়ই?'

তার ইচ্ছা নয়নতারা নিজের মুখেই সব বলুন। কিন্তু তিনি মৃদু হেসে শুধু বলেন, 'ওয়েট অ্যান্ড সি।'

'আপনি বলেছিলেন, আমাদের দু'জনকে কী একটা কাজে লাগাবেন—'

'এই তো সবে যাওয়া-আসা শুরু করলে। ক'দিন যাক না, নিশ্চয়ই লাগাব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ খেয়ে যায় ওরা।

একসময় রণিতা বলে, 'একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।'

নয়নতারা জিজ্ঞাসু চোখে তাকান।

রণিতা বলে, 'আপনি তো এত বড় একজন শিল্পী। আপনার কি আর অভিনয় করতে একেবারেই ইচ্ছে নেই?'

অনেকক্ষণ উত্তর দেন না নয়নতারা। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'নিশ্চয়ই করে। একবার যে ক্যামেরা আর ফুটলাইটের সামনে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে অভিনয় ছেড়ে দেওয়াটা যে কত কষ্টকর, একজন অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস না হলে

সেটা বোঝানো যাবে না। তবে মিনিংফুল, পারপাসফুল ছবি ছাড়া আমি কিছু করব না। আমি চাই না কেউ আমাকে টাকা তৈরির মেশিন হিসেবে ব্যবহার করুক।'

'ধরুন তেমন ছবির অফার নিয়ে কেউ যদি আপনার কাছে আসে?'

'তোমার ভীষণ উৎসাহ দেখছি। তোমার হাতে তেমন কেউ আছে নাকি?'

রণিতা বলে, 'না। তবে খবরের কাগজে যদি লিখি, আপনি আপনার শর্ত অনুযায়ী ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে ফিরতে চান, বহু প্রোডিউসার ডিরেক্টর এ বাড়ির সামনে লাইন লাগিয়ে দেবে।'

নয়নতারা আঁতকে ওঠেন, 'না, একেবারেই না। তোমাদের সঙ্গে জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট হয়েছে, আমাকে না জানিয়ে আমার কোনো খবর বাইরে জানাবে না, সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। যদি কখনও করি প্রোডিউসারদের দরকার নেই। নিজেই সব ব্যবস্থা করব।'

খাওয়া শেষ হলে নয়নতারা বলেন, 'আমাকে এখন তিন ঘণ্টা ছুটি দিতে হবে কিন্তু। ঠিক চারটের সময় আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'দুপুরে কি আপনার ঘুমনোর অভ্যাস আছে?'

'একেবারেই না।'

'তা হলে?'

নয়নতারার মুখে লাজুক একটু হাসি ফোটে। বলেন, 'এই সময়টা একটু আধটু বইটই পড়ি, আর—'

রণিতা বলে, 'আর কী?'

'সামান্য লেখালিখির চেষ্টা করি।'

দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে রণিতা, 'কী লেখেন আপনি? ডায়েরি?'

নয়নতারা বলেন, 'তেমন কিছু নয়।'

এদিকে অমিতেশ তৎপর হয়ে ওঠে। সে জানে নয়নতারার লেখার কোয়ালিটি যেমনই হোক তাঁর নামের মধ্যে একটা ম্যাজিক রয়েছে। ওঁর লেখা ছাপতে পারলে চারদিকে হই হই শুরু হবে, রাতারাতি কাগজের সার্কুলেশন অনেক বেড়ে যাবে। এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায় না। সে বলে, 'ডায়েরি লিখলে আমরা ইন্টারেস্টেড। ফার্স্ট অফারটা কিন্তু আমি দিয়ে রাখলাম। আপনার সব শর্ত মেনে ওটা ছাপাতে চাই। যদি বলেন অ্যাডভান্স অনারেরিয়াম কালই দিয়ে যাব।'

নয়নতারা হাসেন, 'অত ব্যস্ত হতে হবে না। তবে এটুকু জেনে রাখো, ডায়েরি আমি লিখছি না।'

'যা-ই লিখুন আমরা তাই ছাপব।'

'ছাপার যোগ্য কিনা সেটা না জেনেই?'

অমিতেশ বলে, 'আপনি যখন লিখেছেন তখন নিশ্চয়ই ভাল হবে।'

নয়নতারা বলেন, 'আমার ওপর তোমার অগাধ আস্থা দেখছি।' পরক্ষণে চোখ সরু করে, গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে ফের বলেন, 'নাকি আমার নামের গ্ল্যামারটা কাজে লাগাতে চাও?'

অমিতেশ থতমত খেয়ে যায়। মহিলা যে দুর্দান্ত বুদ্ধিমতী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে বলে, 'না না, মানে—'

নয়নতারা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমার অফার আমার মনে থাকবে। এখন দু'জনে ইচ্ছে হলে কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে পার।'

রণিতা বলে, 'আপনি যখন লেখাপড়া করেন, সেই সময়কার কিছু ছবি নিতে চাই।'

'ডকু-ফিচারের জন্যে?'

'হ্যা।'

'ঠিক আছে, পরে নিও।'

নয়নতারা আর দাঁড়ান না, বড় বড় পা ফেলে চলে যান। রণিতারা ঠিক জানে না, তবে ওদের মনে হল, একতলার কোথাও বসে লেখাপড়ার কাজটা করেন নয়নতারা।

দুপুরে বিশ্রাম বা ঘুমনো টুমনো রণিতাদের ধাতে নেই। দোতলার হল-এ সোফায় গা এলিয়ে নয়নতারাকে নিয়ে আলোচনা করে করেই তারা তিনটে ঘণ্টা কাটিয়ে দিল।

উনিশ

ঠিক চারটেতেই নয়নতারার সঙ্গে আবার দেখা হল রণিতাদের। সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে একতলা থেকে তিনি ওপরে উঠে এলেন। সন্ধ্যার হাতে একটা বড় ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম, ক'টা কেক, কিছু বিস্কুট এবং সন্দেশ।

মহিলা যে অত্যন্ত সময়ানুবর্তী, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে তাঁর চলাফেরা, ঘুম-বিশ্রাম, শ্লোকপাঠ, একদিনেই এসব টের পেয়ে গেছে রণিতারা।

ট্রে রেখে চলে যায় সন্ধ্যা। নয়নতারা চা তৈরি করে রণিতাদের দিয়ে নিজে এক কাপ নেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'সারাদিন বাড়ির ভেতর থেকে থেকে খুব একঘেয়ে লাগেছে, না?'

রণিতা বলে, 'না না, একেবারেই না। আমরা বরং আপনাকে নানা দিক থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি।'

জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে ফিচেল ধরনের একটু হাসেন নয়নতারা। মজার গলায় বলেন, 'কোথায় দু'জনে চুটিয়ে প্রেম করে বেড়াবে, তা নয়। আমার মতো এক বৃদ্ধার পেছনে ঘুর ঘুর করছ। কোনো মানে হয়? ক'দিন এখানে যাওয়া-আসা করলে একেবারে বুড়িয়ে যাবে।'

কথাগুলো যে নিছক মজা করার জন্যই বলা তা বুঝতে পারছিল রণিতারা। তারা শুধু হাসে।

নয়নতারা আবার বলেন, 'আমাদের ইস্ট বেঙ্গলে একটা কথা ছিল—সঙ্গ দোষে রং ধরে। আমার সঙ্গে থেকে থেকে একদিন দেখবে চোখে ক্যাটারাক্ট, হাঁটুতে আর্থারাইটিস, এই সব ধরিয়ে ফেলেছ।'

রণিতারা হাসতেই থাকে। নয়নতারা কপট হতাশার একটা ভঙ্গি করে বলেন, 'যাক, আমার বার্ধক্যটা যখন শেয়ার করতেই চাও তখন আর বলার কিছু নেই। এবার বল এখন তোমাদের কী প্রোগ্রাম—'

আগে থেকেই সব ঠিক কবে রেখেছিল রণিতা আর অমিতেশ। রণিতা বলে, 'আপনার সম্বন্ধে অনেক ইনফরমেশন আমরা জোগাড় করেছি। সেগুলো কতটা সত্যি আর কতটা রটনা ভেরিফাই করে নিতে চাই। তা ছাড়া ইস্ট বেঙ্গলে আপনার অনেকগুলো বছর কেটেছে। সে সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। আপনার ঐ লাইফটাও আমাদের জানা দরকার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন নয়নতারা। তারপর বলেন, 'বেশ, ইস্ট বেঙ্গলের ব্যাপারটাই আগে শোন। তোমাদের সঙ্গে টেপ রেকর্ডার আছে তো?'

'আছে।'

'ওটা চালিয়ে দাও।'

অমিতেশ তার ব্যাগ থেকে টেপ রেকর্ডার বার করে সুইচ টিপে সেন্টার টেবলে রাখে। নয়নতারা বলতে শুরু করেন।

নয়নতারা জন্মের পর প্রথম একুশটা বছর কাটিয়েছেন পূর্ব বাংলায়। সেই জীবনটা আদৌ চমকপ্রদ নয়, খুবই সাদামাঠা, নিস্তরঙ্গ। তাঁর বাবা ছিলেন হাই স্কুলে জিওগ্রাফির টিচার। পুরনো জমানার মাস্টারমশাইরা যেমন ছিলেন তিনি

তেমনি আদর্শবাদী, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সৎ এবং বেশ রক্ষণশীলও। নয়নতারা, তখনকার লক্ষ্মী বা মমতা, মা-বাবার একমাত্র সন্তান। খুব একটা সচ্ছলতা ছিল না, তবু বেশ আদরেই মানুষ হয়েছেন। ঢাকার কলেজ থেকে বি.এ পাস করেছিলেন। যে পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছিল সেখানে সবাই অল্পবিস্তর শিক্ষিত। তাঁর স্বামী এবং এক দেওর গ্র্যাজুয়েট, স্বামীর অন্য ভাইয়েরা কেউ ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিল, কেউ সে আমলের ম্যাট্রিকুলেট। তবে ওরা কেউ চাকরি বাকরি করত না। মাঝারি ধরনের পৈতৃক ব্যবসা ছিল ঢাকায়, সবাই সেটা চালাত। অবস্থা মোটামুটি ভালই বলা যায়।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দু-একটা পাশ টাশ করলেও, লেখাপড়ার খুব একটা চর্চা ওখানে ছিল না। ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি টিগ্রি ওরা জোগাড় করেছিল কিছুটা ওজন আর ইমপর্টান্স বাড়বার জন্য। নইলে ওগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

ছোটখাট ব্যবসায়ীদের বাড়ির অখ্যাত গৃহবধূ হয়েই জীবন কেটে যেত সে আমলের মমতা বা লক্ষ্মীর। কিন্তু হঠাৎ দাঙ্গা এবং দেশভাগ হয়ে গেল। দাঙ্গায় তাঁর মা আর বাবা মারা যান। আর দেশভাগের কারণে ভাসতে ভাসতে তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন শরণার্থী হিসেবে।

জীবন সংগ্রাম বলে একটা কথা আছে। তার চেহারা যে কতটা মারাত্মক, এবার সেটা টের পেতে থাকেন লক্ষ্মীরা। তাঁর স্বামী গ্র্যাজুয়েট হওয়ায় একটা কেরানির চাকরি জুটে গেল। তাঁর অন্য ভাইরা এবং শ্বশুর হন্যে হয়ে সারা শহর তোলপাড় করে ফেলতে লাগলেন কিন্তু দশ টাকার একটা কাজও জোগাড় করতে পারলেন না। অথচ বেঁচে তো থাকতে হবে। একজনের সামান্য কেরানির চাকরি সংসারের এতগুলো লোককে তো বাঁচাতে পারে না। তাই লক্ষ্মীকেই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

কলকাতায় এসে প্রথমে কালিঘাটে উঠেছিলেন তাঁরা। তাঁদের পাশাপাশি থাকত ফিল্মের একজন অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর বিনয় ধর। লক্ষ্মীদের অবস্থা দেখে সে ফিল্মে ওঁর কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

নয়নতারা বলেন, 'এর পরের ইতিহাস কারো অজানা নেই। আশা করি তোমরাও জেনে গেছ।'

রণিতা বলে, 'হ্যাঁ। তবু দু-একটা প্রশ্ন আছে।'

'বল—'

'আমরা যেটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি তাতে জানতে পেরেছি, আপনাদের

ফ্যামিলি ছিল ভীষণ কনজারভেটিভ। তাঁরা আপনার ফিল্মে নামাটা যে ভালভাবে নেয়নি, সেটাও আমাদের জানা আছে। কিন্তু আপনার স্বামীর রি-অ্যাকশান কোথাও পাই নি।'

নয়নতারা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে জানান, তাঁর স্বামী ছিলেন ভাল মানুষ, নিরীহ টাইপের এবং ভীষণ চাপা। মুখে কিছু না বললেও তিনি যে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যেত। আসলে পুরুষ মানুষের গোপন অহঙ্কার ছিল তাঁর মধ্যে। স্বামী হয়ে লক্ষ্মীর ভরণ পোষণ করতে পারছেন না, বরং লক্ষ্মীই তাঁদের পরিবারে অন্ন জোগাচ্ছেন, এটাই তাঁকে ভেতরে ভেতরে শেষ করে দিয়েছিল।

অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'ওঁর সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, তর্কাতর্কি হয়েছে?'

'একেবারেই না। ও একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল।'

রণিতা বলে, 'শুনেছি, সিক্সটিজের গোড়ার দিকে আপনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে গলফ ক্লাব রোডের একটা বাড়িতে একাই চলে গিয়েছিলেন। আপনার স্বামী আসেন নি কেন?'

নয়নতারা বলেন, 'ও ছিল পুরনো ধ্যানধারণার মানুষ। স্ত্রীর জন্যে মা-বাবাকে ছাড়তে রাজি হয়নি।'

অমিতেশ মজার গলায় বলে, 'রামচন্দ্রের মডার্ন সংস্করণ।'

নয়নতারা উত্তর দিলেন না।

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'শ্বশুরবাড়িতে থাকলেন না কেন?'

'থাকা গেল না।'

'কারণটা কী?'

'আমার নাম হচ্ছিল। সোসাইটির ভি আই পি'দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছিলাম। তাঁদের ধরে দেওরদের, এমন কি শ্বশুরেরও চাকরি করে দিয়েছি, ননদের এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছি যা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। নতুন একখানা বাড়িও করে দিলাম। তবু ওরা আমার সঙ্গে ভীষণ খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। প্রোডিউসর ডিরেক্টররা তখন লাইন দিয়ে বাড়িতে আসছে, তাদেরও নানাভাবে অপমান করত।'

'আশ্চর্য! আপনার কাছে তো ওদের আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

নয়নতারার মুখে মলিন একটু হাসি ফোটে। তিনি বলেন, 'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স— হীনম্মন্যতা। ঘরের বউয়ের গাদা গাদা

ছবি বেরুচ্ছে খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে, সারা শহর জুড়ে তার কাট-আউট, তার মুখ দিয়ে পোস্টার, হোর্ডিং। এত নাম তার, অজস্র টাকা আনছে সে, তার দয়ায় সবার চাকরি হয়েছে - এসব কি মেনে নেওয়া যায়! হিউম্যান নেচার একটা বিচিত্র জিনিস।'

কিছুদিন আগে নয়নতারার খোঁজে তাঁর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল রণিতারা। তাঁর দেওর তাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করে। হেতুটা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে যায়। কয়েক পলক কী ভেবে রণিতা বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন না?'

'মনে করার মতো আশা করি কোনো প্রশ্ন করবে না।'

'শুনেই দেখুন না--'

নয়নতারা উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি একজন হাউস ওয়াইফ। ফ্যামিলি পিসের জন্য ফিল্মটা তো ছেড়ে দিতে পারতেন।'

'বাঘের পিঠে কখনও চড়েছ?'

'না, মানে--'

নয়নতারা গভীর গলায় বলেন, 'চড়লে আর নামা যায় না। আমিও তেমনি সাকসেসের কাঁধে তখন চেপেছি। গ্ল্যামার, টাকা, নাম-- এসব ছাড়ার কথা ভাবতেও পারতাম না, অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে তখন ছুটছি।'

একটু চুপ।

তারপর রণিতা বলে, 'শুনেছি, আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক শেষ দিকে আর ছিল না।'

নয়নতারা বলেন, 'ঠিকই শুনেছ।'

'ডিভোর্স হয়েছিল কি?'

'না। তবে ডিভোর্সের চাইতে ভাল কিছুও তো হয়নি।' বলতে বলতে একটু থামেন নয়নতারা। মুখ নামিয়ে চাপা বিষণ্ন সুরে বলেন, 'তারপর তো ও মারাই গেল। আমাকে না জানিয়ে ওকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটলাম। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে কাছে যেতে দিল না, কুৎসিত গালাগাল করতে লাগল। এদিকে আমাকে দেখে প্রচুর ভিড় জমে গিয়েছিল। কী বিশ্রী সিচুয়েশন ভেবে দেখ। নিরুপায় হয়ে পালিয়ে এলাম। স্বামীকে শেষ দেখাটাও ওরা দেখতে দিল না।'

এরপর অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। দোতলার এই বিশাল ঘরে গাঢ় স্তব্ধতা নেমে আসে।

'কতজনের সঙ্গে আমাকে শুতে হয়েছে?' নয়নতারা মনে মনে হিসেব করে বলেন, 'টোয়েন্টি-- ইয়েস কুড়ি জন।'

রণিতা চমকে ওঠে। রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি যা বললেন তা কি ডকু-ফিচারে ইউজ করতে পারি?'

এক মুহূর্তও চিন্তা করলেন না নয়নতারা। বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমাদের দেশের বায়োগ্রাফি বা অটোবায়োগ্রাফিগুলোতে এত মিথ্যে বা হাফ-ট্রুথ থাকে যে তাকে কোনোভাবেই নিখুঁত বলা যায় না। বিখ্যাত পুরুষ হলে তাকে দেবতা, আর মহিলা হলে তাকে দেবী বানাবার চেষ্টা। আরে বাবা, দোষত্রুটি ভালমন্দ মিশিয়েই তো মানুষ, সাদাকালো নিয়েই জীবনের ড্রামা। কেউ কেউ পরিস্থিতির শিকার হয়ে যায়, যেমন আমি হয়েছিলাম। ব্ল্যাক সাইডটা বাদ দিলে লাইফ তো ম্যাড়মেড়ে, ওয়ান-ডাইমেনশানাল হয়ে যায়। তার কি কোনো চার্ম থাকে?'

রণিতারা চুপ।

নয়নতারা বলেন, 'তোমাকে যা বললাম তার একটা শব্দও বাদ দেবে না।'

রণিতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'ঐ কুড়িজন কারা?'

নয়নতারা চোখ বুজে ঠোঁট টিপে কী ভাবেন। তারপর বলেন, 'সেটা এখন বলছি না।'

'কেন?'

'এদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরা রয়েছে। তারা ওদের ঘৃণা করুক, ওদের পারিবারিক শান্তি নষ্ট হোক, সেটা আমি চাইছি না। তবে এই লোকগুলোর নাম এবং কখন কিভাবে ওরা আমার শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে রেকর্ড হিসেবে সব একটা ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। আমি ওগুলো প্রকাশ করতে চাই না। আমার মৃত্যুর পর কারো হাতে ডায়েরিগুলো পড়লে কী হবে, জানি না।'

রণিতারা কোনো প্রশ্ন করে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

নয়নতারা একটানা বলে যান, 'হয়তো কোনোদিন সেসব প্রকাশ হয়ে পড়বে, হয়তো বা গোপনই থেকে যাবে।'

রণিতা হঠাৎ বলে ওঠে, 'যে কুড়ি জনের কথা বললেন, আপনি নাম করার পর তাদের সঙ্গে আর কি দেখা হয়েছে?'

'ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে তারপরও এতকাল কাটিয়ে দিলাম, দেখা হবে না?'

'সেই সময় আপনার সঙ্গে ওদের ব্যবহারটা কেমন ছিল?'

'প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করলে ভাল হয়। ওদের না, আমার ব্যবহার কেমন ছিল। ঐসব বাস্টার্ডদের সঙ্গে রাস্তার কুকুরের মতো ব্যবহার করতাম। আমি যে

ছবিতে নামতাম তখন সেটা সুপার ডুপার হিট হয়ে যেত। মিনিমাম 'ফুল হাউস'-এ গোল্ডেন জুবিলি তো হতই। ঐ লোকগুলো এসে লিটারেলি আমার পায়ে ধরত, তাদের ছবিতে যদি দয়া করে অভিনয় করি। আমাকে নামাতে পারলে সিওর বক্স অফিস সাকসেস।'

'আপনি নামতেন ওদের ছবিতে!'

'হ্যাঁ, নামতাম।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে রণিতারা।

নয়নতারা বলেন, 'একশ'বার ঘুরিয়ে, ফ্যাবুলাস অ্যামাউন্ট নিয়ে ছবিতে সাইন করতাম। শুটিংয়ের সময় যত ভাবে পারি ট্রাবল দিয়েছি। এক শিফটে যেখানে আট ঘন্টা কাজ করার কথা সেখানে আধ ঘন্টা কাজ করেছি। দিনের পর দিন শুটিং করতে যাই নি। মেক-আপ নেবার পর 'মুড নেই' বলে বাড়ি চলে এসেছি। কাউকে কাউকে দিয়ে জুতোর স্ট্র্যাপ পর্যন্ত বাঁধিয়ে ছেড়েছি। প্রতি মোমেন্টে বুঝিয়ে দিয়েছি, পুরনো কথা ভুলি নি।'

রণিতা বলে, 'এতে তো ওদের ক্ষতি হয়েছে।'

'অবশ্যই হয়েছে। আর সেটাই তো আমি চাইতাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো, প্রতিটা ছবিই বক্স অফিসে সাকসেস পেয়েছে।'

'রিভেঞ্জটা তা হলে ওভাবে নিয়েছেন?'

'তা একরকম বলতে পার।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'নাম করার পর কেউ আর সুযোগ নিতে চেষ্টা কবে নি?'

নয়নতারা বলেন, 'কোনো শুয়ারের বাচ্চাকে পা ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও হাত দিতে দিই নি।'

মহিলার ক্রোধ এবং আক্রোশ যে এতদিন বাদেও কত তীব্র আকারে জমা হয়ে আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না রণিতার। সে বলে, 'আপনার স্বামী যখন মারা যান, আপনার বয়স তখন আর কত, খুব বেশি হলে তিরিশ টিরিশ—'

'হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে।'

'সেই সময় কারও সঙ্গে ইমোশানাল অ্যাটাচমেন্ট কিছু হয় নি?'

একটা চোখ ছোট করে নয়নতারা বলেন, 'তার মানে প্রেম করেছি কিনা জানতে চাইছ?'

রণিতা বলে, 'হ্যাঁ। দু'জন হিরোর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তাঁরা তো বলেন—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে নয়নতারা বলেন, 'অমলকুমার আর চিরঞ্জীবের কথা বলছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'পঁচিশ তিরিশ বছর আগেই ওদের বাজার শেষ হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে যখন ক্রেজ চলছে, ওদের তখন আর তেমন ডিমাণ্ড নেই। হিরো হবার অফার ওরা তখন পেত না বললেই হয়। দাদা, কাকা কি অন্য কোনো ক্যারেক্টার রোলেই বেশি নামত। আজকাল তো লোকে ওদের প্রায় ভুলেই গেছে। মাঝে মাঝে কাগজে দেখি অমলকুমার আমাকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে কিছু কিছু স্ক্যাণ্ডাল বানিয়ে বাজারে ছাড়ে। সব বেসলেস, মিথ্যে। আসলে পাবলিসিটি হোক, ওর নাম নতুন করে লোকের মনে পড়ুক, খুব সম্ভব এটাই সে চায়। আমি আর কী করতে পারি বল। মনে মনে শুধু হাসি। তবে চিরঞ্জীব ঐ ধরনের নয়।'

হঠাৎ অন্য একজন হিরোর কথা মনে পড়ে রণিতার। মাত্র ক'দিন আগে এঁর কথা জানতে পেরেছে সে। জিজ্ঞেস করে, 'আর প্রশান্ত ঘোষাল?'

একটু চুপ করে থাকেন নয়নতারা। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'হি ইজ আ পারফেক্ট জেন্টলম্যান। কালচারড, ডিসেন্ট। আমার ওপর তিনি খুবই সিমপ্যাথেটিক। স্বীকার করছি ওঁর সঙ্গে আমার একটা ইমোশানাল অ্যাটাচমেন্ট ঘটেছিল। আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম। রুচি এবং মানসিকতার দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট মিল ছিল।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'তখন কি আপনার স্বামী জীবিত ছিলেন?'

'না।'

'তা হলে বিয়ে করে আপনারা একসঙ্গে থাকলেন না কেন? এটা একটা আইডিয়াল ম্যারেজ হতে পারত।'

এই বিয়েটা না হওয়ায় নয়নতারা যে একদিন ভেঙে পড়েছিলেন, সেই হতাশা যে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর মুখচোখ দেখে সেটা টের পাওয়া গেল। জোরে শ্বাস টেনে বিষণ্ন সুরে বলেন, 'তার উপায় ছিল না।'

রণিতা বলে, 'কেন?'

'সে অনেক কথা--'

'প্লিজ বলুন।'

নয়নতারা আর আপত্তি করলেন না। ব্যক্তিগত যে ইতিহাস দীর্ঘকাল সঙ্গোপনে ছিল তা প্রকাশ করার জন্য অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা হয়তো ভেতরে ভেতরে তীব্র হচ্ছিল। রণিতাদের মতো সহৃদয় শ্রোতা পেয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে তা বেরিয়ে আসতে লাগল।

নয়নতারা বলেন 'আজ আর কনফেস করতে দ্বিধা নেই, শুধু ভালবাসা নয়, আমরা পরস্পরকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। নিজের স্বামীকে যে ভালবাসিনি, তা নয়। সেটা বোধহয় সামাজিক সংস্কার পালনের জন্য। সমাজে দশজনের মধ্যে থাকতে গেলে স্বামীকে ভালবাসতে হয়, সেই নিয়মটা পালন করে গেছি। তবে এটা ঠিক, অনেক দিন এক সঙ্গে থাকলে মানসিক একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার স্বামী মানুষটা খারাপ ছিল না, ওর ওপর কেমন একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের প্রেমটা যে কী, তা প্রশান্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর বুঝতে পারলাম। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। মাঝে মাঝেই আমরা কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যেতাম। এই নিয়ে সে আমলে মিডিয়াগুলোতে কিছু স্ক্যাণ্ডাল রটেছে, আমরা গ্রাহ্য করতাম না। টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় আমাদের নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড চলত। তবে সামনাসামনি কারো কিছু বলার সাহস ছিল না। কেননা আমরা যে ছবিতে নামতাম তা পয়সা দিত। কে কী বলবে? অকপটে বলছি, ওর সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্কও ছিল।'

'তবে এ বিয়েটা হল না কেন?'

'আমার দিক থেকে অসুবিধে ছিল না। তখন আমি একেবারে মুক্ত। আমরা মনে মনে তৈরিও হচ্ছিলাম, কিন্তু--'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না নয়নতারা। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে বাঁ ধারের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে অদৃশ্য টিভির পর্দায় যেন তাঁর ফেলে আসা জীবনের কিছু ছবি ফুটে উঠতে থাকে। আকাশে চোখ রেখেই বলেন, 'একদিন দুপুরবেলা একজন বিধবা বয়স্কা মহিলা একটি শ্যামলা রঙের সুশ্রী বিবাহিত তরুণীকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বিধবা মহিলাটি প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিলেন। তিনি প্রশান্তর মা, আর তরুণীটি তার স্ত্রী। স্ত্রীর নাম অমলা। এভাবে যে তাঁরা আসবেন, ভাবতে পারি নি, তাছাড়া প্রশান্তর যে বিবাহিত, আমার জানা ছিল না। একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, খানিকটা সামলে নিয়ে ওদের আসার উদ্দেশ্যটা জানতে চাইলাম। প্রশান্তর মা আমার দু'হাত ধরে বললেন, 'অমলার মা-বাবা নেই, মামার কাছে মানুষ এবং সে বোবা এবং কালা এটা গোপন রেখে তার সঙ্গে প্রশান্তর মামাশ্বশুররা ওর বিয়ে দেয়। যখন প্রতারণাটা ধরা পড়ে প্রশান্ত স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। স্বাভাবিক কারণেই দাম্পত্য জীবনে সে ঘোর অসুখী। কিন্তু অমলা খুবই ভাল মেয়ে। তার যেমন মায়া-মমতা তেমনি কর্তব্যবোধ। এখন যদি প্রশান্ত নয়নতারাকে বিয়ে করে, আইন অনুযায়ী অমলাকে ডিভোর্স করতে হবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ হলে মামার সংসারে জায়গা হবে না তার, প্রশান্তদের বাড়িতেও থাকা সম্ভব হবে না। কোথায় যাবে দুঃখী অসহায় মেয়েটা? প্রশান্তর মা আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই মেয়েটার জন্যে আমি আমার ছেলেকে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।' লক্ষ করলাম, অমলার বড় বড় সরল নিষ্পাপ চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। আমার বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। তবু প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বললাম, 'আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ছেলে অমলারই থাকবে।' আমাকে প্রচুর আশীর্বাদ করে ভদ্রমহিলা পুত্রবধূকে নিয়ে চলে গেলেন। সেই মুহূর্ত থেকে প্রশান্তর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর রইল না।'

এরপর ঘরের ভেতর অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে আসে।

অনেকক্ষণ পর চোখ দুটো আবার হল-ঘরে ফিরিয়ে আনেন নয়নতারা। মলিন একটু হাসি ফোটে তাঁর মুখে। বলেন, 'আশা করি প্রশান্তর সঙ্গে আমার বিয়ে না হওয়ার একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ব্যাখ্যা দিতে পেরেছি।'

বিমর্ষ সুরে রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার সঙ্গে প্রশান্ত ঘোষালের আর দেখা হয় নি?'

'হবে না কেন? তার সঙ্গে এরপর কত ছবিতে কাজ করেছি, দেখা তো হবেই। এক ছবিতে কাজ না করলেও স্টুডিওতে তো যেতে হত। দেখতাম ও অন্য ছবির কাজ করছে।'

'বিয়ে নিয়ে কোনো কথা হত না?'

'আমি বলে দিয়েছিলাম, বন্ধুত্ব ছাড়া আমাদের ভেতর আর কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত না। আগেই বলেছি, প্রশান্ত ভদ্রলোক, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। আমার ফ্ল্যাটে কখনও আসত না। টেলিফোনে অবশ্য খোঁজখবর নিত, কোনো দরকার আছে কিনা জিজ্ঞেস করত।'

'এখনও কি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়?'

'না। আট বছর আগে স্টেজ আর ফিল্ম ছেড়ে দিলাম, তারপর আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখি নি।'

এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নয়নতারা গভীর ঘোরে যেন ডুবে থাকেন। কতক্ষণ কেটে যায় কারো খেয়াল থাকে না।

একসময় নয়নতারা আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে নিজেকে তুলে আনেন। ঘোরটা অনেকখানি কেটে গেছে। কিছুটা তরল গলায় বলেন, 'আমার আর কোনো অ্যাফেয়ার নিয়ে প্রশ্ন আছে?'

'আছে।'

'যথা--'

রণিতা বলে, 'শুনেছি একজন পলিটিক্যাল লিডার এক সময় আপনাকে খুব জ্বালিয়েছিল।'

নয়নতারা হাসতে হাসতে বলেন, 'ওহ্, এত খবরও জোগাড় করেছ! ফিল্মমেকার না হয়ে তোমার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে যাওয়া উচিত ছিল।'

রণিতা হাসে। বলে, 'যা বলেছেন, আপনার সম্পর্কে মেটিরিয়াল জোগাড় করতে গিয়ে আমাকে একজন ছোটখাট শার্লক হোমস হতে হয়েছে। এবার জননেতাটির কথা বলুন--'

নয়নতারা বলেন, 'একজন না, দু'জন পলিটিক্যাল লিডার। রমাপতি সরমেল আর জ্যোতিষ বটব্যাল।'

রণিতা বলে, 'রমাপতির কথা ডিটেল কাগজে পড়েছি। কিন্তু জ্যোতিষ বটব্যাল সম্পর্কে কিছুই জানি না। যদি এর সম্বন্ধে বলেন—'

নয়নতারা বলেন, 'এরকম স্কাউন্ড্রেল আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। একেবারে দু-কান কাটা, নির্লজ্জ। আগে নাম-করা মাস্তান ছিল, একজন এম.পি'র হয়ে মারদাঙ্গা করত, ছাপ্পা ভোট দিত, বুথ জ্যাম করে তার 'স্যার'কে জেতাবার ব্যবস্থা করত। এসব করতে করতে তার তৃতীয় নয়ন খুলে গেল। এই কৌশলে যদি ইলেকশানে জেতা যায় তা হলে সে দোষটা করল কী? কিছু মাসল পাওয়ার, কয়েকটা রাইফেল, কিছু বোমা, এসব তো তার হাতে আছেই, অতএব ভোট পাওয়াটা এমন কী ব্যাপার?' নয়নতারা বলতে থাকেন, 'ব্যাক-গ্রাউন্ডটা সাতকাহন করে বলছি, তার কারণ লোকটাকে বুঝতে সুবিধে হবে।'

রণিতা বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।'

নয়নতারা ফের শুরু করেন, 'তা ছাড়া মস্তানদের লোকে ভয় পেলেও মনে মনে ঘৃণা করে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে পারলে মানুষ খাতির করে, স্যালুট পাওয়া যায়, সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ে। লোকটা অতএব পলিটিকসে এসে গেল। পলিটিকসের চেয়ে বড় বিজনেস তো আর নেই। আমি সবার কথা বলছি না, তবে বেশির ভাগই একবার এম এল এ, এম পি বা মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারলে নিচের চোদ্দ পুরুষ নবাবের হালে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। এই লোকটি মস্তানি ছেড়ে দিল। তার নিজস্ব একটা বাহিনী ছিল। তারাই তার হয়ে ইলেকশানে খাটল। পুরনো বদনাম ঘুচিয়ে ভাল একটা ইমেজ তৈরি করার জন্যে নিজেকে পুরোপুরি পালটে ফেলল সে। শুধু বন্দুক দিয়ে খানিকটা ভোট টানা যায়, ইলেকশান

পুরোপুরি জেতা যায় না। তার জন্যে আলাদা কৌশল দরকার। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটা সোসাল ওয়ার্কার অর্থাৎ সমাজসেবীর ইমেজ তৈরি করা যায়। ভবিষ্যতের জন্যে ছক কেটে এগুতে লাগল সে। মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে তার এলাকার অনেকগুলো পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়ে বসল। পটাপট ক'টা টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করল, বস্তির কয়েকটি দুঃস্থ মেয়ের বিয়ে দিল। ক্লাবে ক্লাবে ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম কিনে দিল। অনেকটা রবিন হুডের মতো ব্যাপার।'

নয়নতারা আরো যা বলেন তা এইরকম। কয়েক বছরের ভেতর লোকটা পুরনো বদনাম প্রায় সবটাই কাটিয়ে রীতিমত একজন নেতা হয়ে উঠল। খুবই 'প্রতিভাশালী' সে। একদিন তার নজর এসে পড়ল নয়নতারার ওপর। গোড়ায় এক মাস কি দু'মাস পর একবার ফোন করত, গদগদ হয়ে বলত, সে নয়নতারার একনিষ্ঠ ভক্ত, তার প্রতিটি ছবি আর নাটক ওর দেখা। একজন ব্যস্ত জননেতা বিপুল কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ফ্লিম-টিল্ম দেখে ফোন করছে, এ তো শুধু খুশি নয়, রোমাঞ্চিত হবার মতো ঘটনা।

ক্রমশ ফোনের উৎপাতটা বাড়তে লাগল। এক-দু'মাসের বদলে কবে রোজ রাতে সে 'রিং' করা শুরু করল, এখন আর মনে পড়ে না। কিন্তু পরম ভক্তটির ভেতর থেকে দ্রুত অন্য একটা চেহারা বেরিয়ে আসতে লাগল। নয়নতারাকে রোজ একবার না দেখতে পেলে জীবন নাকি ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার আবদার, প্রতিদিন রাতে সে একবার নয়নতারার বাড়ি আসবে। কোনো ভয় নেই, কেউ যাতে টের না পায়, সেইভাবেই যাবে সে। পরিষ্কার বোঝা গেল, লুকিয়ে চুরিয়ে সে অভিসারে আসতে চায়। নয়নতারা বুঝিয়ে দিলেন, অমন একটা বেয়াড়া সময়ে তাকে কোনোভাবেই তাঁর বাড়িতে অভ্যর্থনা জানানো সম্ভব নয়। শোনার পর সে বিকল্প একটা প্রস্তাব দিল। সাদার্ন অ্যাভেনিউতে তার একটা বড় ফ্ল্যাট আছে। রোজ ঘন্টাখানেকের জন্যও যদি নয়নতারা একবার সেখানে যান সে কৃতার্থ হবে। নয়নতারা এ প্রস্তাবও নাকচ করে দিলেন।

এরপর উৎপাতের চেহারাটা বদলে যেতে লাগল। সেই সময় নয়নতারা যেসব ছবিতে সাইন করেছেন তার সবগুলোরই বেশির ভাগ শুটিং হচ্ছিল আউটডোরে। মাসের ভেতর পনের কুড়ি দিন বাইরে বাইরে কাটাতে হত। কখনও উটি, কখনও দার্জিলিং, নৈনিতাল বা জয়শলমীর। শুটিং স্পটগুলোর কাছাকাছি কোনো হোটেলে থাকতেন। যখন যে হোটেলেই উঠুন, দেখা যেত, তাঁর পাশের স্যুইটটি দখল করে আছে সেই নেতাটি। কিভাবে যে তাঁর আউটডোরে যাবার খবর জোগাড় করত কে জানে।

দিনের বেলা যেন নয়নতারাকে চেনে না, এমন একটা ভান করত লোকটা কিন্তু রাত্তিরে হোটেলটা ঘুমিয়ে পড়লে দরজায় ধাক্কা দিত। জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সে।

প্রথম দিকে ঐরকম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পলিটিক্যাল লিডারের বিরুদ্ধে কড়া স্টেপ নেবার কথা ভাবতেও সাহস হচ্ছিল না নয়নতারার। লোকটা তাঁর ক্ষতি করে দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

নয়নতারা বলেন, 'আত্মরক্ষার জন্যে এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। কী করলাম জানো?'

রণিতারা কিছু বলার আগে ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলে নয়নতারা বলে যান, 'হ্যাঁ, যা ওষুধ লাগে কিনে দিও... সাতাশ নম্বর ওই বস্তির স্কুলটার জন্যে সব চেয়ার টেবল আমি কিনে দেবো... হ্যাঁ, চিন্তা করো না।'

এর আগেও একদিন কাকে যেন এভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন নয়নতারা। তাঁর যে নানারকম গোপন দান ধ্যান আছে, এতদিনে তা জেনে গেছে রণিতারা।

কথাবার্তা শেষ করে নয়নতারা টেলিফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে বলেন, 'যা বলছিলাম – একদিন দার্জিলিংয়ের এক হোটেলে লোকটা মাঝরাতে যখন দরজায় টোকা দিল, আমি দরজা খুলে সোজা তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম।'

রণিতা এবং অমিতেশ চমকে ওঠে, 'বলেন কী!'

'ইয়েস – ' আস্তে মাথা নাড়েন নয়নতারা।

'তারপর- ' শিরদাঁড়া টান টান করে বসে রণিতারা।

মজার গলায় নয়নতারা প্রশ্ন করেন, 'তারপর কী হতে পারে অনুমান করতে পার?'

খানিক চিন্তা করে রণিতা আর অমিতেশ একসঙ্গে বলে ওঠে, 'না।'

'নেতাটিকে বললাম, আর একবার বিরক্ত করলে কলকাতায় ফিরে প্রেস কনফারেন্স করে তার স্বরূপটি জানিয়ে দেব। শুধু তাই না, যে কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে ভোটে দাঁড়াবে সেখানে মিনিমাম দশটা মিটিং করে সবাইকে জিজ্ঞেস করব, এইরকম দুশ্চরিত্র লম্পটকে কি আপনাদের প্রতিনিধি করতে চান? শুনে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেল লোকটা। সে আমার পপুলারিটির কথা জানে। আমি পাবলিক মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বললে সেটা ওর পক্ষে মারাত্মক হবে। একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেসের চাইতে পলিটিকাল পাওয়ার যে অনেক বেশি লাভজনক সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি ওর ছিল। ফলে--'

'ফলে কী?'

'একটি কথাও না বলে ল্যাজ গুটিয়ে আমার স্যুইট থেকে পালাল। পরের দিন ঘুম থেকে ওঠার পর শুনলাম দার্জিলিং থেকেই সরে পড়েছে।'

'পরে আর আপনাকে ফোন টোন করে নি?'

'নেভার।'

'দেখা হয় নি?'

'মনে পড়ছে না। বোধ হয় না।'

রণিতা হাসতে হাসতে বলে, 'নেতাটিকে দারুণ ওষুধ দিয়েছিলেন তো?'

'তা দিয়েছিলাম।' নয়নতারাও হাসতে থাকেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর নয়নতারা বলেন, 'নেতাটিকে নিয়ে যা যা ঘটেছে সব তোমাদের বললাম। অথচ লোকে ব্যাপারটাকে ডিসটর্ট করে, নানা রকম রং চড়িয়ে এমন একটা রগরগে স্ক্যান্ডাল তৈরি করেছিল যেন লোকটার সঙ্গে শোওয়া ছাড়া জীবনে আমার আর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

রণিতারা উত্তর দেয় না।

নয়নতারা এবার বলেন, 'যাদের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে স্ক্যান্ডাল রটেছে, কিংবা যাদের সঙ্গে ইমোশানাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের সবার কথাই বলা হল। আমি কিন্তু কিছুই লুকোই নি। আশা করি, তোমাদের ডকু-ফিচারের জন্যে 'গরম' কিছু মেটিরিয়াল পেয়ে গেলে।' বলে এক চোখ টিপে হাসলেন। তাঁর হাসিটি ফিচলেমিতে ভরা।

অমিতেশ এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। সামনের দিকে ঝুঁকে সে চাপা গলায় বলে, 'প্রায় সবার কথাই বলেছেন, শুধু একজন বাদ।'

অবাক হয়ে নয়নতারা জিজ্ঞেস করেন, 'কার কথা বলছ?' তাঁর প্রশ্নটি শেষ হতে না হতেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। পরক্ষণে দোতলার হল-ঘরে যিনি উঠে আসেন তাঁকে আগে না দেখলেও কিছুকাল আগে নর্থ বেঙ্গল থেকে এক মহিলার বেনামি চিঠিতে তাঁর চেহারার বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল। বর্ণনাটি এতই নিখুঁত যে অমিতেশ আর রণিতার স্পষ্ট মনে আছে। অতএব ভদ্রলোককে চিনতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

নয়নতারা বলেন, 'তোমার না সকালে আসার কথা ছিল? এত দেরি করলে?'

ভদ্রলোক বলেন, 'একটা ঝামেলায় আটকে গেলাম। তাই--'

নয়নতারা বলেন, 'ও। এস তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। এ হল- '

'আলাপ না করিয়ে দিলেও চলবে। তোমার মুখে ওদের কথা এত শুনেছি যে ইনট্রোডিউস না করে দিলেও চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। ওরা হল রণিতা আর অমিতেশ।'

অমিতেশ বলে, 'আমরাও আপনাকে চিনি। পরিচয় করানোর দরকার নেই।'

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে নয়নতারা জিজ্ঞেস করেন, 'চেনো? এ কে বল তো?'

'সমরেশ ভৌমিক।'

'তোমরা জানলে কী করে? আগে কি কখনও ওকে দেখেছ?'

'না।'

'তা হলে?'

অমিতেশ চকিতে একবার রণিতার দিকে তাকায়। সে যা বলতে চায় সেটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝে নিতে চায়। রণিতা মাথা নাড়ে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে।

অমিতেশ বলে, 'নর্থ বেঙ্গল থেকে মাসখানেক আগে আমরা একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে ওঁর চেহারার ডেসক্রিপশান আছে। তার থেকেই চিনে ফেললাম।'

'শুধু ডেসক্রিপশান থেকে চেনা যায়?'

'তা হয়তো যায় না। তবে চিঠিটায় এমন কিছু আছে যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে উনি সমরেশ ভৌমিক ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না। তা ছাড়া মাঝে মাঝে আপনি ফোনে কোনো এক সমরেশ-এর সঙ্গে কথা বলেন। তার থেকেও ক্লু পেয়ে গেলাম।'

নয়নতারা গালে তর্জনী ঠেকিয়ে বলেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ছেলেমেয়ে রে বাবা!'

সমরেশ শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে ছিলেন। বলেন, 'চিঠিটা কে লিখেছে?'

রণিতা বলে, 'নিচে নাম নেই। অ্যানোনিমাস লেটার।'

'আমার সম্বন্ধে কী লেখা আছে তাতে?'

'সত্যিই শুনতে চান?'

সমরেশ রীতিমত থতিয়ে যান। গলার স্বর নামিয়ে বলেন, 'আপত্তির কিছু নেই।'

রণিতা বলে, 'সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে খুব প্রীতিকর হবে না।'

নয়নতারা ওদের লক্ষ করছিলেন। বলেন, 'বুঝেছি, ওই চিঠি তোমার স্ত্রী শীলা দিয়েছে।'

সমরেশ চুপ করে থাকেন।

অমিতেশ এই সময় বলে, 'কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম, ইমোশানাল রিলেশানশিপ গড়ে উঠেছিল, এমন সবার কথা জানালেও, একজনের কথা আপনি গোপন করে রেখেছেন। সমরেশবাবু সম্পর্কেই বলেছি। ওঁর সঙ্গে আপনি যে এখনও গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন সেটা না বলে দিলেও চলে।'

নয়নতারা স্তম্ভিত। সমরেশের সামনে এমন চাঁছাছোলা ভাষায় কেউ যে বলতে পারে, ভাবা যায় না।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতেশের মনে হয়, এভাবে বলাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। সে বলে, 'আসলে কী জানেন, আপনাদের আঘাত দেবার বা বিব্রত করার জন্যে আমি কথাটা বলিনি। শুধু জানতে চেয়েছি ট্রুথ, ট্রুথ ওনলি, যেটুকু পেলে আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ স্ক্রিন আর স্টেজ পার্সোনালিটিকে বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে।'

অনেকক্ষণ স্থির চোখে অমিতেশের দিকে তাকিয়ে থাকেন নয়নতারা। তারপর বলেন, 'কোন ট্রুথ তুমি জানতে চাও?'

অমিতেশ বলে, 'আপনি তো অকপটে নিজের জীবনের এমন সব কথা বলেছেন যা ভারতবর্ষের অন্য কোনো মহিলা বলত কিনা সন্দেহ। আমি জানতে চাইছি সমরেশবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা ঠিক কী ধরনের?'

এক মুহূর্তও না ভেবে নয়নতারা বলেন, 'গভীর বন্ধুত্বের। এবং তোমরা যা ইঙ্গিত করছ সেটা একেবারেই ঠিক নয়।'

'ইঙ্গিত? কিসের?'

'তোমরা নিশ্চয়ই জানতে চাইছ, সমরেশের সঙ্গে কোনোরকম ফিজিক্যাল রিলেশন আছে কিনা-- এই তো?'

যে অমিতেশ অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, ঘুরিয়ে কথা বলা যার একেবারেই অপছন্দ সে পর্যন্ত বিব্রত বোধ করে। সমরেশের সামনে এভাবে নয়নতারা বলবেন, ভাবা যায়নি, যদিও ঠিক এটাই জানতে চেয়েছে অমিতেশ। তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

অমিতেশকে লক্ষ করতে করতে হয়তো একটু করুণাই হয় নয়নতারার। চোখ টিপে মজার গলায় বলেন, 'ও আমার শুধু বন্ধু-- প্রাণের সখা। ওই যে দারুণ একটা পদ আছে, 'নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়--' ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হুবহু তাই। জানো, যে আটটা বছর আমি অজ্ঞাতবাসে আছি, ও আমাকে আগলে আগলে রেখেছে। সমরেশ পাশে না থাকলে আমার কী অসুবিধা যে হতো বলে বোঝাতে পারব না।'

অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, 'উনি থাকেন কোথায়?'

সকৌতুকে নয়নতারা বলেন, 'তুমি যে একেবারে ক্রিমিনাল ল'ইয়ারের মতো জেরা শুরু করলে!' একটু থেমে বলেন, 'কী জানতে চাইছ তা অবশ্য বুঝতে পারছি। আমি আর সমরেশ একই বাড়িতে থাকি কিনা— কেমন?'

অমিতেশ চুপ।

নয়নতারা বলেন, 'এক বাড়িতে থাকলে আমাদের সম্বন্ধে একটা খুব সহজ কনক্লুসনে যে কেউ আসতে পারে। যদিও একটু আগে জানিয়েছি আমাদের সম্পর্কের ভেতর সেক্সের আঁশটে গন্ধ নেই, তবু হয়তো তোমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যত বার যেভাবেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাও, আমার উত্তর একটাই-- সমরেশ আমার বন্ধু এবং প্রেমিকও। তবে প্রেম তো বহুৎ কিসিমকা। সব সময় একটি পুরুষ আর একটি রমণীর বিছানায় ওঠাটাই তার আলটিমেট গোল নয় অমিতেশ। সে যাক, তোমার অবগতির জন্যে জানাই, যাদবপুরে সমরেশের একটা ফ্ল্যাট আছে। ও সেখানেই থাকে এবং রোজ একবার এখানে এসে আমার দেখাশোনা করে যায়।'

রণিতা এই সময় আচমকা বলে ওঠে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না?'

নয়নতারা বলেন, 'না, করব না।'

'সমরেশবাবুর সঙ্গে আপনার যা সম্পর্ক, সে ব্যাপারে বিবেকের দিক থেকে আপনি কি পরিষ্কার?'

চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় নয়নতারার। ধীরে ধীরে অনুচ্চ কিন্তু তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন, একজন হিরোর সঙ্গে আপনার হৃদয়ঘটিত রিলেশান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি বিবাহিত জানার পর তাঁর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। সেদিক থেকে সমরেশবাবুর সঙ্গেও তো আপনার যোগাযোগ থাকার কথা নয়।'

শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় নয়নতারার। তীক্ষ্ণ চোখে রণিতাকে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'তার মানে?'

'মানে সমরেশবাবুও বিবাহিত। এথিকসের—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় রণিতা।

নয়নতারা হকচকিয়ে যান। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি, তারপর বলেন, 'সমরেশ বিবাহিত, তুমি জানলে কী করে?' হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায়

পরক্ষণে দ্রুত বলে ওঠেন, 'ও, বুঝেছি। বেনামা যে চিঠিটা পেয়েছ তাতেই এই খবরটা রয়েছে, কী বল?'

'হ্যাঁ।'

নিঃশব্দে বসে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন সমরেশ। বলেন, 'নিশ্চয়ই শীলা এ সব জানিয়েছে।'

রণিতা সমরেশের দিকে ঘুরে বসে, 'নয়নতারা দেবী সম্পর্কে যেমন, তেমনি আপনার সম্বন্ধেও ওই চিঠিতে প্রচুর অভিযোগ। আপনার ছেলেমেয়ে স্ত্রী, সবাইকে নাকি ভাসিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সমরেশ। অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থাকার পর বলেন, 'অভিযোগটা ঠিক। সংসারের প্রতি বিশেষ কোনো কর্তব্য আমি পালন করতে পারিনি। কিন্তু মানুষ তো দেবতা নয়। নয়নের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাকে ঘর থেকে বার করে এনেছিল।'

'এর জন্যে আপনি কি অনুতপ্ত?'

'সন্তান এবং স্ত্রীর জন্যে দুঃখ হয়, মনও খারাপ লাগে, কিন্তু অনুতাপ নেই।'

'কিন্তু--'

হাত তুলে রণিতাকে থামিয়ে দিয়ে সমরেশ বলেন, 'তুমি হয়তো বলতে চাইছ স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের ফেলেও এলাম, বাইরে এসেও কিছুই পেলাম না।'

রণিতা বলে, 'হ্যাঁ, মানে--'

সমরেশ বলেন, 'বিশ্বাস কর, নয়নের কাছে আমি এমন কিছু পেয়েছি যা এই পৃথিবীতে আর কেউ আমাকে দিতে পারত না।'

'কী সেটা?'

'তোমাদের এই বয়সে তা বুঝবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর সমরেশ অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে ওঠেন, 'পাপপুণ্য নিয়ে আমি চিন্তা করি না। মৃত্যুর পর মানুষের কী পরিণতি, আমার জানা নেই। হয়তো অনন্ত নরকে আমার স্থান হবে। তবে একটা কথা স্পষ্ট করে বলি, এ জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, কিন্তু পেয়েছি তার বহুগুণ। তাতেই আমার তৃপ্তি। এর জন্যে আমাকে বহু মূল্য দিতে হয়েছে। পরলোক বলে যদি কিছু থাকে সেখানেও অপেক্ষা করছে চরম কোনো শাস্তি। তার জন্যে আমি প্রস্তুত। এটাই আমার নিয়তি।'

সমরেশ যেন কাছে বসে নেই, অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর বুঝিবা অদৃশ্য বায়ুস্তর ভেদ করে ভেসে আসতে থাকে।

রণিতা বা অমিতেশ কেউ আর কোনো প্রশ্ন করে না। হল-ঘরের আবহাওয়া কেমন যেন ভারি হয়ে উঠতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর নয়নতারা বলেন, 'লাভ, সেক্স, স্ক্যান্ডাল, পাপপুণ্য— এ সব তো অনেক হল। কিন্তু এর বাইরেও জীবনে আরো অনেক কিছু আছে। এবার বরং সে বিষয়ে একটু মন দেওয়া যাক।'

রণিতা আর অমিতেশ চকিত হয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' নয়নতারা সমরেশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'কসবার ওই জায়গাটাকে ঘিরে কম্পাউণ্ড ওয়াল তোলার ব্যবস্থা করেছ তো?'

সমরেশ বলেন, 'কাল মিস্তিরিদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কী খরচ পড়বে ওদের জানাতে বলেছি। চিন্তা করো না, দিন পনের কুড়ির ভেতর ওয়াল উঠে যাবে।'

কসবার কোন জায়গাটা নিয়ে নয়নতারারা কথা বলছেন, রণিতার বুঝতে অসুবিধে হয় নি। সে জিজ্ঞেস করে, 'জমিটা কেনা হয়ে গেছে?'

ওই জমিটার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে রণিতারা যে কসবায় ছুটেছিল তা নিয়ে নয়নতারার সঙ্গে আগেই একদিন ওদের আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, লাস্ট উইকে রেজিস্ট্রি হয়েছে।'

রণিতা মনে মনে ভেবে দেখল, সেই সময়টা সে জ্বরে বিছানায় পড়ে ছিল। নইলে এই কেনার খবরটা আগেই জেনে যেত। বলল, 'ওখানে মেয়েদের একটা হোম করার কথা ভেবেছিলেন না?'

নয়নতারা বলেন, 'হোমই তো করব।'

'কোন মেয়েদের জন্যে?'

'আর কয়েক দিন অপেক্ষা কর, সব জানতে পারবে।' বলে সমরেশকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওদের কবে রিলিজ করা হচ্ছে?'

সমরেশ বলেন, 'নেক্সট মানথে।'

'ওদের থাকার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছ?'

'না। এখনও করে উঠতে পারি নি। তিনজন দালালের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। টালিগঞ্জে একটা বাড়ি কয়েক বছরের জন্যে লিজে পাওয়া যাবে, মনে হচ্ছে।'

'ওরা রিলিজ পাওয়ার আগে যেভাবেই হোক বাড়িটার ডিল কমপ্লিট করে ফেলবে। নইলে খুব মুশকিলে পড়ে যাব।'

'ডিল হয়ে যাবে।'

কারা কোত্থেকে রিলিজ পাবে, কাদের থাকার জন্য বাড়ি লিজ নেওয়া হবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এ সব সম্পর্কে রণিতা জানতে চায়।

নয়নতারা এবারও তাকে ধৈর্য ধরতে বলেন।

রণিতা আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

একুশ

আরো কয়েক দিন কেটে যায়।

এর ভেতর নয়নতারার দৈনন্দিন রুটিনটা মুখস্থ হয়ে গেছে রণিতাদের। ভোরবেলায় উঠে প্রথমে আসন, তারপর স্নান, স্তোত্রপাঠ, নিজের স্টাডিতে বসে নিবিষ্ট হয়ে লেখাপড়া-- এইসব কর্মসূচিতে কোনোরকম হেরফের নেই। এরই ফাঁকে ফাঁকে বাইরের লোকজনের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা তো আছেই।

নিয়মিত যাতায়াতের ফলে রণিতাদের জানা হয়ে গেছে, গোপনে প্রচুর দান করে থাকেন নয়নতারা। সারা জীবনে অজস্র টাকা রোজগার করেছেন তিনি। তার একটা বড় অংশ ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছেন। এতে মোটা সুদ পাওয়া যায়। সেই টাকাটা বহুজনের হিতে অকাতরে খরচ করে থাকেন। কোন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান পয়সার অভাবে বস্তিতে ওষুধপত্র দিতে পারছে না, কোথায় কোন গ্রাম বন্যায় ভেসে গেছে-- জানা মাত্র টাকা পাঠিয়ে দেন।

নয়নতারার পক্ষে তো বাড়ি থেকে বেরুনো সম্ভব না। বেরুলে মিডিয়ার লোকেরা একেবারে হুলস্থুল বাধিয়ে ছাড়বে। তাঁর অজ্ঞাতবাসের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাঁর হয়ে এ সব করে থাকেন সমরেশ।

আসলে মানুষের জন্য কিছু করতে চান নয়নতারা। এখনও গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কী পাননি তিনি? অর্থ, খ্যাতি, সম্মান, যশ, সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে. দুর্নাম। সব সময় তিনি প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে। তাঁকে ঘিরে সারা দেশ জুড়ে আজও প্রবল উন্মাদনা। কিন্তু এ সব নয়নতারাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। জীবনের অন্য একটি অর্থও যে আছে, একদিন তারই খোঁজে তিনি সব কিছু ছেড়ে গ্ল্যামারের জগৎ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশি কিছু

করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মিডিয়া তাঁর এমন একটা ইমেজ তৈরি করে দিয়েছে যে সেটা ভেঙে একজন সাধারণ নাগরিকের মতো রাস্তায় বেরিয়ে কিছু যে করবেন তার উপায় নেই। সেই জন্যই সমরেশকে তাঁর প্রয়োজন। সমরেশকে দিয়েই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

একদিন খুব সকালে আলিপুরে এসে বেশ অবাকই হল রণিতা আর অমিতেশ। দোতলার হল-ঘরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন সমরেশ এবং নয়নতারা। সমরেশ কখনও এত সকালের দিকে এ বাড়িতে আসেন না। অসময়ে তাঁর আসাটাই রণিতাদের বিস্ময়ের কারণ।

হল-এ বসে ব্রেকফাস্ট করতে করতে নয়নতারা বললেন, 'তোমাদের অনেক বার বলেছি, একটা জরুরি কাজে তোমাদের সাহায্য চাই। মনে আছে?'

রণিতা বলে, 'নিশ্চয়ই। কী কাজ বলুন না--'

'নন-ক্রিমিনাল লুনাটিক কাদের বলে জানো?'

'জানি। যারা অপরাধী নয়, তবে নানা কারণে যাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে--'

'ঠিক। এরকম বত্রিশটি নানা বয়সের মেয়েকে জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। কাল তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।'

রণিতা শিরদাঁড়া টান টান করে বলে, 'এদের রিলিজের কথাই কি সেদিন মিস্টার ভৌমিককে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন নয়নতারা। বলেন, 'এই মেয়েদের আত্মীয়স্বজনরা ওদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে চায় না।'

রণিতা চমকে ওঠে, 'তা হলে ওরা কোথায় যাবে? কে দেখবে ওদের?'

নয়নতারা জানান, এই নিরাশ্রয় মেয়েদের জন্য টালিগঞ্জে আপাতত কয়েক বছরের জন্য একটা বাড়ি লিজ নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কসবায় যে জমিটা তিনি কিনেছেন সেখানে একটা চারতলা বাড়ি করা হবে। সেটা হয়ে গেলে, মেয়েরা ওখানে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের সব দায়িত্ব নয়নতারার। এই কাজটা যদি শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, নিজের বেঁচে থাকার একটা অর্থ হয়।

অনেক আগে থেকেই এই পরমাশ্চর্য মহিলাটিকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল রণিতা। শ্রদ্ধাটা এখন শতগুণ বেড়ে যায়। অভিভূতের মতো সে নয়নতারার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নয়নতারা বলেন, 'এবার শোন তোমাদের কাছে কী সাহায্য চাই।'

উৎসুক সুরে রণিতা বলে, 'বলুন।'

'যে মেয়েদের কাল জেল থেকে ছেড়ে দিচ্ছে তাদের চিকিৎসা আর খাওয়া-পরার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার। তাছাড়া ওদের জন্যে কসবায় বাড়িটাও করতে হবে। আমার কাছে অত টাকা নেই যাতে এতবড় দায়িত্ব পালন করা যায়। তাই কিছুদিন ধরেই ভাবছি—' কথা শেষ না করে তিনি থেমে যান।

রণিতা কিছু বলে না, উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

নয়নতারা বলেন, 'ভাবছি, আমি আবার অভিনয়ের মধ্যে ফিরে যাব। এ ছাড়া কোথায় টাকা পাব?' বলে একটু হাসেন।

রণিতার স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় যেন। সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ তো দারুণ খবর। কোন ডিরেক্টরের ছবিতে নামবেন, কিছু ঠিক হয়েছে?'

'ফিল্মে নামছি না।'

'তবে?'

'স্টেজে নামব।'

'কী নাটক?'

''দ্রৌপদী।' ওটা আমারই লেখা। তোমরা জানতে চেয়েছিলে না, আমি কী লিখি? সেদিন জানাই নি, আজ বলি তিন বছর ধরে একটু একটু করে ওই নাটকটা লিখেছি। মহাভারতের এই চরিত্রটা আমার কাছে দারুণ সিগনিফিকান্ট মনে হয়েছে। লিখে খুব আনন্দ পেয়েছি।' নয়নতারা বলতে থাকেন, 'আর একটা কথা, এই নাটকে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই।'

রণিতা জিজ্ঞেস করে, 'কিরকম?'

'দ্রৌপদী তো বটেই, তাকে ঘিরে যত চরিত্র এসেছে সবগুলোতেই আমি অভিনয় করব।'

একটু চুপ।

তারপর নয়নতারা আবার বলেন, 'আপাতত এই অভিনয়ের ব্যাপারে কোনো প্রচার আমি চাই না। মিউজিক ডিরেক্টর বসন্ত মুখার্জি আর লাইটের সুনীল সেনকে দু-একদিনের ভেতর ফোন করব। তোমরা ওঁদের এখানে নিয়ে আসবে।'

'ওঁরা যদি কাউকে জানিয়ে দেন?'

'আমি অনুরোধ করলে আগে থেকে কাউকে জানাবেন না। ওঁদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। ফাইনাল রিহার্সাল হবার পর তোমরা 'কলাকুঞ্জ' হলটা ভাড়া করবে, দর্শকদের জন্যে টিকেট ছাপাবে, পুলিশ আর কর্পোরেশনের

পারমিসান নেবে। তারপর টিভি আর কাগজে কাগজে আমার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবে। অনেক দিন পর স্টেজে নামতে যাচ্ছি, একটু নার্ভাস লাগছে। তোমাদের কি ধারণা, লোকে আমার নাটকটা দেখবে না?'

অমিতেশ আর রণিতা একসঙ্গে বলে ওঠে, 'দেখবে না মানে! সারা শহর আপনার নাটকের জন্যে উন্মাদ হয়ে যাবে।'

'কলাকুঞ্জ' কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত হল। ওখানে অনুষ্ঠান করার জন্য মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির অফিসার্স ক্লাব থেকে শুরু করে বড় বড় গ্রুপ থিয়েটারগুলো সারা বছর লাইন দিয়ে থাকে।

মাস দুই ঘোরাঘুরির পর 'দ্রৌপদী' নাটকের জন্য একটা ডেট পাওয়া গেল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে আপাতত দশটা শো করা হবে। তাতেও যদি সব টাকা না ওঠে, আরো শো করতে হবে।

নাটক মঞ্চস্থ হবার কুড়ি দিন আগে পাবলিসিটি শুরু হল। নয়নতারার চার ফুট ছবিওলা পোস্টারে পোস্টারে গোটা শহর ছয়লাপ। তা ছাড়া কাগজে কাগজে বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগল। টিভিতেও দিনে দু বার করে প্রচার চলল। বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো নাটকটা স্পনসর করার জন্য রণিতাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। প্রথম শো-এর জন্য নয়নতারা স্পনসর নিতে একেবারেই রাজি নন। যা করার রণিতাদের সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্যোগেই আপাতত করতে চান।

রণিতারা যা ভেবেছিল, দেখা গেল নয়নতারার নাটক নিয়ে উদ্দীপনা তার হাজার গুণ বেশি। অ্যাডভান্স বুকিংয়ের কাউন্টার খোলা হয়েছিল পাঁচ দিন আগে। টিকেটের জন্য এক কিলোমিটার লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছিল। কাউন্টার খোলার দু ঘন্টার ভেতর সব টিকেট শেষ। যারা টিকেট পায় নি, খেপে গিয়ে কাউন্টার ভাঙচুর করেছে। অগত্যা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছে, খুব শিগগিরই আবার 'দ্রৌপদী'র শো করা হবে। 'কলাকুঞ্জ'-এ বুকিং না পাওয়া গেলে অন্য হল-এ নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন নয়নতারা।

আসলে গত আট বছরে এত বড় ঘটনা সাংস্কৃতিক জগতে আর ঘটে নি। নয়নতারা আবার অভিনয় করবেন, এটা জানা মাত্র সারা শহর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

নাটকের জন্য নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেল। যারা টিকেট পেয়েছে তারা অনেক আগেই হল-এ ঢুকে পড়েছে। যারা পায় নি, এমন কয়েক হাজার মানুষ

নয়নতারাকে দেখার জন্য 'কলাকুঞ্জ'-এর সামনে দু ঘণ্টা আগে থেকে জমা হয়েছে। ভিড়ের ভেঁতর দিয়ে হল-এ যেতে বেশ কষ্টই হল নয়নতারার।

ভেতরে শ'খানেক ফটোগ্রাফার আর টিভি'র ক্যামেরাম্যান গিস গিস করছিল।

কিছুক্ষণ পর পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেই দ্রৌপদীর মেক-আপ নিয়ে নয়নতারা মঞ্চে প্রবেশ করলেন, চারদিক থেকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশগুলো অনবরত জ্বলতে লাগল। গোটা হল-এর দেড় হাজার দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে যেন হিস্টিরিয়ার ঘোরে চেঁচাতে চেঁচাতে হাততালি দিতে থাকে। আট বছর বাদে তাঁকে দেখে সবাই যেন উন্মাদ হয়ে গেছে।

কী আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব নয়নতারার! হাত তুলে সবাইকে পলকে থামিয়ে দেন। তারপর শুরু হয় অভিনয়।

এক পাশে মঞ্চের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল রণিতা। কয়েক মিনিটের ভেতর সে টের পায় সমস্ত হলটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে। মঞ্চে এখন যেন এক অপার্থিব ম্যাজিক তৈরি হচ্ছে।

যে নয়নতারাকে চার মাস ধরে দেখে আসছে রণিতা, তাঁকে এখন আর চেনা যায় না। তাঁর কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, চলাফেরা, তাকানো, সব আগাগোড়া বদলে গেছে। মহাভারতের দ্রৌপদীকে তিনি যেন ধীরে ধীরে নির্মাণ করছেন। পলকহীন, আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে ছিল রণিতা। এতকাল বাদে যে উদ্দেশ্যে নয়নতারা মঞ্চে উঠেছেন সেটা যেন তাঁকে ক্রমশ মহিমান্বিত করে তুলছিল।

জীবনে পূর্ণতা কাকে বলে, নয়নতারাকে দেখতে দেখতে বার বার তা উপলব্ধি হচ্ছিল রণিতার।